Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ সংসার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 23100120489

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির ﷺ সংসার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 23100120489

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির ﷺ সংসার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার, আইডিঃ 23100120489 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির ﷺ সংসার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফারজানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারজানা আক্তার

আইডিঃ 23100120489

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 9

রাসুল (ﷺ) এর পৃথিবীতে আগমন 10

জন্মঃ 10

শৈশবঃ 11

নবীজির ﷺ বিবাহ 14

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজিﷺ 15

মুহাব্বত করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন 16

নবীজি ﷺ স্ত্রীদেরকে সময় দিতেন 18

নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে খেলতেন এবং গল্প করতেন। 19

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না 20

ঘর থেকে বের হওয়া সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন 22

স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে খাওয়াতেন 23

স্ত্রী যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, একই স্থানে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুখ লাগিয়ে পান করতেন:- 24

স্ত্রীর ঘরের কাজে সাহায্য করা 24

স্ত্রীর কোলে হেলান দিয়ে তিলাওয়াত করা 25

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক 25

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক 28

স্ত্রীর খেলাধুলা 31

স্ত্রীদের নিয়ে খেলা দেখতে যেতেন 32

দাওয়াতে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন 32

স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন 33

স্ত্রীকে প্রহার না করা 34

স্ত্রীর ভালো গুন দেখা 35
স্ত্রীর অনূভুতির প্রতি খেয়াল রাখা 35
নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন 35
স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন 38
অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের স্বান্তনা দিতেন 38
স্ত্রীর পরিচিত মানুষদের সাথে উদার আচরণ করতেন 39
স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন 40
দুঃখ-কষ্টে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা 40
ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুতেন 41
স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা এবং নিজেকে পরিপাটি রাখতেন 42
স্ত্রীদের সাজসজ্জা সুযোগ দেওয়া 43
স্ত্রীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন 44
স্ত্রীকে সফরের সঙ্গী বানানো 45
ভ্রমন করার সময় স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন 46
সফরে ধীরে উঠ চালানোর নির্দেশ দিতেন 46
স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন 47
স্ত্রীর রাগে নবীজির ﷺ আচরণ 48
স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা 48
স্ত্রীর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সহমর্মিতা 48
খারাপ সময়ে স্ত্রীর নিন্দা না করা 49
স্ত্রীদের খুনসুটি 49
স্ত্রীদের প্রতি গায়রত 50
জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি 52
রাসুল ﷺ স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন 53

স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া 54
স্ত্রীদের প্রতি নবিজীﷺ উপদেশ এবং স্ত্রীদেরকে মুমিন নারীদের আদর্শ হিসেবে বিনির্মান 54
স্ত্রীদেরকে ইবাদত ও নফল আদায়ের শিক্ষা দিতেন 55
আল্লাহর নিকট পছন্দের আমল সম্পর্কে স্ত্রীদের জানানো 56
স্ত্রীদের ইখলাসের শিক্ষা দিতেন 57
স্ত্রীদের উপকারী জিকির শেখাতেন 59
বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন 60
সচ্চরিত হওয়া শেখাতেন 62
মন্দের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে স্ত্রীদের শেখাতেন 63
রাসুল ﷺ তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদতগুলো শেখাতেন 64
তাকওয়া অর্জন ও ভালো ব্যবহার করতে বলতেন 64
সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন 64
স্ত্রীদের নম্রতার সঙ্গে কথা বলা শিখিয়েছেন 65
স্ত্রীদের মধ্যে মন্দ কিছু দেখলে তা শুধরিয়ে দিতেন। 66
রমজানের শেষ দশ দিন ইবাদত এর জন্য জাগিয়ে দিতেন 68
অন্যান্য ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন 68
ইবাদতে অতিরিক্ত কাঠিন্য ও রেষারেষি পছন্দ করতেন না 69
ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আদেশ দিতেন 69
বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা দিতেন 70
স্ত্রীদের মধ্যে যে দান করবে বেশি সে জান্নাতে নবীজির ﷺ সাথে সবার আগে মিলিত হবে 71
না জেনে কোন বিষয়ে ফতোয়া বা বিধান দিতে নিষেধ করেছেন 72
ছোট ছোট পাপের ব্যাপারে স্ত্রীদের সাবধান করতেন 73
মাসআলা দুর্বোধ্য মনে হলে স্ত্রীগন বারবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন 73

ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা আদায় করার উপদেশ দিতেন 74
নবীজির ﷺ সাংসারিক সমস্যা ও তার সমাধান 75
স্ত্রীদের ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা 76
তাহরীমের ঘটনা 80
ইফকের ঘটনা 83
ইফকের ঘটনা থেকে আমরা যা শিক্ষা পাই তা হলো:- 94
রাসুলুল্লাহ ﷺ সন্তানদের সঙ্গে যেমন আচরণ করতেন 96
রাসুল ﷺ এর সন্তানসন্ততি 96
তাহনিক 97
দু'আ 97
সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা 99
চুল কাটা, আকিকা করা এবং খতনা করা 100
সন্তানদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ 103
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মেয়েদের বিয়ে 103
মোহরানা 105
বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাসস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন 106
অলিমা করা 107
বর ও কনের জন্য দু'আ করা 108
বিয়ের পরও মেয়ের দেখাশোনা 108
কন্যাদের কেউ তাঁর কাছে বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন 110
উপহার প্রদান 111
দুনিয়াবিমুখতা শিক্ষা দেয়া 111
নফল নামাজের কথা স্মরণ করে দেয়া 114
কন্যাকে আল্লাহর শাস্তির বিষয় জানানো 115

কন্যাকে সুসংবাদ দেয়া 116
সন্তানদের জিকির ও দু'আ শিখাতেন.....117
সন্তানদের মৃত্যুতে শোকাহত হওয়া.....117
আত্মীয়তার বন্ধন.....118
রাসুলুল্লাহ ﷺ নাতিনদের সাথে যেমন ছিলেন.....118
নাতিদের প্রতি ভালোবাসা 119
হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন.....121
রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মীয় - স্বজনদের সাথে যেমন ছিলেন.....122
উপসংহার 127

ভূমিকা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। দুরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর।তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবিদের ওপর।

আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মতোন এক অধমিনী বান্দিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিষয় কিছু লেখার তাওফিক দান করেছেন। ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

নবীজি ﷺ হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক। আমাদের আদর্শ। যাকে অনুসরণ করা মানে আল্লাহ কে খুঁজে পাওয়া। যাকে খুশি করা মানে আল্লাহ কে খুশি করা। যার কথার অমান্য হওয়া অর্থ আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন আমাদের কে শিখিয়ে দিতে জানিয়ে দিতে কীভাবে আমরা আল্লাহর পথে চলতে পারবো। তাঁর ﷺ মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবো।

শিশু জন্মের পর থেকেই কোন কিছু শিখে আসে না। আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে আর সবকিছু জানতে থাকে। শিশুকে লালন-পালন করা শেখানোতে মা বাবার ভূমিকা অনেক। শিশুকে কীভাবে যত্ন করতে হবে,পরিবার, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, কীভাবে চললে আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট হবেন ইত্যাদি যাবতীয় সকল কিছু আমাদের নবীজি ﷺ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

সংসারে সুখ দুঃখ মিলিয়ে থাকতে হয়। কখনো বা ঝগড়া, অভিমান ইত্যাদি টক মিষ্টি ঝাল এর মতোন উপভোগ করতে হয় এই সংসার জীবন। সংসারে যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তার সমাধান ও রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সমাধান করতে হবে,কখন কোন সময় কিরূপ আচরণ করতে হবে।

পরিবারকে জান্নাতের এক টুকরো বানাতে চাইলে অবশ্যই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরন করতে হবে, জানতে হবে সবকিছু।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, আর তোমরা তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট করো না।

[সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩]

রাসুল (ﷺ) এর পৃথিবীতে আগমন

জন্মঃ

সময় দ্রুত শেষ হওয়ার দিকে ছুটে চলছে । আর মানুষ চলছে কখনো আপন রবের দিকে কখনো বা ছুটছে ধ্বংসের দিকে।

রাসুল ﷺ এর জন্মের সময় আরব এবং পুরো বিশ্বের অবস্থা ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিপর্যস্ত। সে সময়ের মানুষদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য একজন নেতার প্রয়োজন ছিলো। তখনকার মানুষ জাহেলিয়াতে ডুবে ছিলো। তবে কেউ কেউ বিশ্বাস রাখতো একজন নেতা আসবেন। যিনি হবেন সমগ্র বিশ্ব জাহানের নেতা। যার নেতৃত্বে সব ঠিক হয়ে যাবে,যার আগমনে পৃথিবীর সবকিছু আনন্দে দিশেহারা হবে। যিনি নিয়ে আসবেন রবের তরফ থেকে আসমানী বাণী।

যখন মানুষ জাহেলিয়াতে মগ্ন ছিলো তখন আমেনা বিনতে ওয়াহাব অপেক্ষায় ছিলেন এক আনন্দ মূহুর্তের। তিনি অপেক্ষা করছেন। আমেনার মনে হচ্ছে পাখির পালকের মতো হালকা একটি শিশুর শরীর,এর চেয়ে হালকা এবং সহজ কিছু তিনি কখনো বহন করেননি। তিনি দেখছেন, তাঁর কাছ থেকে একটি জ্যেতি বেরিয়ে গিয়ে বসরার

প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। এই আলোর দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে,মুহাম্মাদের ﷺ বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

রাসুল ﷺ জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসে। মক্কার শ্রেষ্ঠ গোত্র কুরাইশ গোত্রে। কুরাইশ সর্দার আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুলাহ এবং পুত্রবধূ আমেনার গৃহ এই সৌভাগ্য অর্জন করেন। নাতির খবর শুনে আবদুল মুত্তালিব ছুটে চলে আসেন পূত্রবধু আমেনার কাছে, তিনি নাম রাখেন "মুহাম্মদ" যার অর্থ যিনি প্রশংসিত।

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শৈশবঃ

পিতৃহীন শিশু মুহাম্মদﷺ কয়েকদিন তাঁর মায়ের কাছে ছিলেন,মায়ের সাথে সাথে দুধপান করান উম্মে আইমান। কিছুদিন পর সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী শিশু মুহাম্মদকেﷺ পাঠিয়ে দেয়া হয় গ্রাম থেকে আসা হালিমার হাতে। তারা বিশ্বাস করেন গ্রামীণ পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ। হালিমাতুস সাদিয়া ছিলেন রাসুলের ﷺ দুধ মা। তিনি রাসুল ﷺ কে নিয়ে নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার দরিদ্র ঘরে নেমে আসলো বরকতের বৃষ্টি। শিশু মুহাম্মদﷺ খুব দ্রুতই বেড়ে উঠলেন। আর তাঁরা আবিষ্কার করতে থাকে যে আল্লাহ তাআলা শিশুর উসিলায় তাদেরকে রহমতের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। অন্যান্য শিশুরা দুই বছরের যতটুকু না বড় হলো মুহাম্মদﷺ তার চেয়ে বেশি বড় হয়েছে এবং দেখতেও চমৎকার লাগছিল। রাসুলﷺ দুধমা হালিমা তাঁরﷺ মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে আরও কিছু সময় শিশু মুহাম্মাদকেﷺ তাঁর কাছে রাখলেন। একদিন মুহাম্মদﷺ তাঁর দুধ ভাই এর সাথে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ আসমান থেকে ফেরেশতা এসে মুহাম্মদেরﷺ বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করেন এবং হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে সেখান থেকে জমাটবাঁধা রক্তের দুটি কালো টুকরো বের করে ফেলে দিয়ে বলেন,এটি আপনার দেহে শয়তানের অংশ। তারপর বরফযুক্ত ঠান্ডা পানি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ধৌত করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বুক জোড়া লাগিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। এদিকে মাঠে থাকা ছোটো ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে হালিমাকে বলে-মুহাম্মাদকেﷺ মেরে

ফেলা হয়েছে। হালিমা সব কাজকর্ম ফেলে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে দেখেন- মুহাম্মাদﷺ বিবর্ণ মুখে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন।

[সহিহ মুসলিম, ১৬২; তবাকাতুল কুবরা, ১/১১৯; তারিখে দিমাশক, ৩/৪৫৮-৪৬৩/ (ফুলের সংসার)]

হালিমা রাদিআল্লাহু আনহা মুহাম্মদকেﷺ খুব বেশি ভালোবাসতেন। তিনি চাইতেন না কেউ তাঁর ক্ষতি করুক, তাই দ্রুত মক্কায় গিয়ে মুহাম্মদকেﷺ তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু মায়ের সাথে মাত্র ২ বছর কাটাতে পেরেছেন। তাঁরﷺ ছয় বছর বয়সে মা আমেনা মক্কা ফেরার পথে আবওয়া এলাকায় ইন্তেকাল করেন।

পিতা-মাতা হারা ছোট্ট মুহাম্মদকেﷺ আগলে রাখেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। ছোট্ট মুহাম্মদকেﷺ দাদা আবদুল মুত্তালিব বড্ড বেশি ভালোবাসতেন,
স্নেহ করতেন,সবসময় আগলে রাখতেন,যখনই খাবার খেতে বসতেন, বলতেন-আগে আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে এসো। একদিন ছোট্ট মুহাম্মদকে রেখে তাঁর দাদা ও চলে যান অনন্তকালের পথে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুহাম্মদকেﷺ চাচা আবু তালিবের স্নেহছায়ায় আশ্রয় দান করলেন। তিনিই ছিলেন নবীজিরﷺ সর্বশেষ অভিভাবক। নবীজিরﷺ আট বছর বয়স থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আগলে রেখেছেন অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন চাচা আবু তালিব। অনেক বেশিই ভালোবাসতেন আবু তালিব নবীজিকেﷺ। নবীজিﷺ ও চাচাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন।
নবুওয়ত প্রাপ্তির পর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সব রকম বিপদ আপদে তিনি পাশে ছিলেন।

শৈশবে তিনি যারই সান্নিধ্যে গিয়েছেন, সে-ই বুঝেছে যে, এই শিশুকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে; কিন্তু সে-উদ্দেশ্য যে কী, সেটা কেবল জানতেন আবু তালিব। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য অভিভাবক- হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা আব্দুল মুত্তালিব-কেউই সে-কথা জানতেন না। আবু তালিবের

জানার কারণ হলো, একবার সিরিয়া-যাত্রায় তিনি শিশু মুহাম্মাদকেﷺ সঙ্গে নেন। সেই যাত্রায় এক ধর্মযাজকের সঙ্গে আবু তালিবের দেখা হয়। ধর্মযাজক মুহাম্মাদের পিঠে নবুওয়াতের মোহর দেখে তাকে চিনে ফেলেন এবং আবু তালিবকে সতর্ক করে বলেন- 'এই বালকটিই প্রতিশ্রুত শেষ-নবী। তাওরাত ও ইঞ্জিলে এরই আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সংবাদটি যেন একান্ত গোপন থাকে।'

অন্যান্য শিশুদের মতোন নবীজি ﷺ ছিলেন না। তিনিﷺ সবসময় আসমানী সুরক্ষায় সুরক্ষিত থাকতেন। কখনোই গুনাহের কাজে লিপ্ত হননি। তারঁﷺ মাঝে কখনোই নীচতা, হীনতা, মিথ্যের আশ্রয় বা দুর্ব্যবহার কিছু ই প্রকাশ পায় নি। শিশুরা সচারাচর যেমন হয়, ছেলেমানুষী তাঁরﷺ মধ্যে দেখা যায় নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সবার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনিﷺ হচ্ছেন শান্তির বার্তাবাহক,ধণী-গরিব, স্বাধীন-পরাধীন, আরব-অনারব সকলের জন্য রহমত।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।”

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

নবীজির ﷺ বিবাহ

"হে নবী (সা.)! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি প্রদান করেছ; আর বৈধ করেছি আল্লাহ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ) হিসেবে তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে, আর তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, তোমার মামার কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে হিজরাত করেছে। আর কোন মু'মিন নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ, এটা মু'মিনদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে তোমার জন্য যাতে তোমার কোন অসুবিধে না হয়। মু'মিনগণের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা জানা আছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা আহযাব আয়াতঃ ৫০)

নিঃসন্দেহে নবীজিরﷺ স্ত্রীরা পরম সৌভাগ্যবতী ছিলেন। স্বামী হিসেবে তাঁরা পেয়েছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মানুষ।

রাসুলﷺ এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ।
নবীজিরﷺ বিশ্বস্ততার গল্প শুনেন খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা। তখন থেকেই তাঁর মনে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগতো। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা এর বিশাল ব্যবসায়ে যোগ দেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা রাসুলﷺ এর বিশ্বস্ততা, আমানত,সত্যতা, পরিশুদ্ধ ক্বলব দেখে বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে নবীজিরﷺ কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নবীজিﷺ তাঁর চাচাকে বিষয়টি অবহিত করেন। পরিশেষে দু'টি আত্মা এক হয়। ভালোবাসায় ভরে উঠে তাঁদের মাঝে। একে অপরকে বিপদে আপদে সাহায্য করে।

খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজিরﷺ সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। উম্মুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত হয় খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা। তাঁর গর্ভে ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দুই জন ছেলে ৪ জন মেয়ে। ছোট থাকতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্ররা মারা যান। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মক্কায় থাকতে খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা

ইন্তেকাল করেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কোন বিয়ে করেন নি।

এরপর কালে ক্রমে বিভিন্ন ঘটনায় নবীজিﷺ আরও ১০ জন নারীকে বিয়ে করেন,তাঁর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলো।
১১ জন স্ত্রীরা হলো:-

১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। ২. আয়িশা বিনতে আবু বকর। ৩. হাফসা বিনতে উমর। ৪. সাওদা বিনতে জামআ আমিরিয়্যা। ৫. জাইনাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়্যা। ৬. জাইনাব বিনতে খুজাইমা হিলালিয়্যা। ৭. উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমিয়্যা। ৮. উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফইয়ান উমাবিয়্যা। ৯. মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালিয়্যা। ১০. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস মুসতালাকিয়্যা ও ১১. সাফিয়া বিনতে হুয়াই নাজিরিয়া।(রাদিআল্লাহু আনহুন্না)

সবার সাথে সমঝোতা রাখতেন,সম্মান করতেন যত্ন নিতেন,স্ত্রীদের প্রতিটি বিষয়ে খেয়াল রাখতেন,দ্বীন চর্চা করাতেন। একজন আদর্শ স্বামীর সকল গুন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে ছিলো এবং আমাদের কে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা বিনিময় করতে হয়।

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজিﷺ

- **নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,**

“তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম, তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।”

[সুনান আত-তিরমিযী,হাদিস নং ১১৬২]

নবীজিﷺ ছিলেন স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোত্তম। তিনিﷺ স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ সম্পর্ক ছিল মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। তিনিﷺ

তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। স্ত্রীদের প্রতিটি বিষয় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়াল রাখতেন। কখনো অসুস্থ হলে সেবা করতেন,কখনো কোন খারাপ কিছু দেখলে নরম স্বরে বুঝিয়ে দিতেন। সারা বিশ্বের নেতা হয়েও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর স্ত্রীদেরকে সময় দিতেন, তাদের দেখাশুনা করতেন, স্ত্রীদের হক আদায় করতেন। এমনকি স্ত্রীদের সাথে খুনশুটিও করতেন। স্ত্রীদেরকে নিয়ে তালিম করতেন।

নবীজি ﷺ ঘরে এসে নিজের কাজ নিজে করতেন, কখনো কাজের জন্য স্ত্রীদেরকে বকাঝকা করতেন না কিংবা কটু কথা শুনাতেন না। কখনো নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে উঁচু স্বরে কথা বলেননি। সবসময় তাঁদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন, তাঁদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তিনি নারীদের অধিকার রক্ষায় সবসময় সোচ্চার ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীদের সাথে পরম ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

বিয়ের পর সুখি ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার সব উপকরণই তিনি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন।

মুহাব্বত করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন

স্ত্রীদেরকে মুহাব্বত করে উপনামে ডাকা রাসুল (ﷺ) এর সুন্নাহ। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে আদর করে উপনামে ডাকতেন। উপনামে ডেকে স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন তবে এর মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ও হাদিসে বর্ণিত নামটি হলো "হুমায়রা"। যা নবীজি ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কে ডাকতেন।

এটি একটি উপনাম, যা এসেছে আরবি শব্দ আল-হামরা থেকে। এর অর্থ লালচে সাদা রঙ। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা গায়ের রঙের জন্য নবীজি ﷺ এই শব্দটি ব্যবহার করতেন।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, “একদিন কিছু হাবশি বালক মসজিদে ঢুকে খেলতে শুরু করল। তখন আল্লাহর রাসুলﷺ আমাকে বললেন, 'হুমাইরা',তুমি কি তাদের(খেলা)দেখবে?'আমি বললাম, 'হ্যাঁ।”

[সুনানে আল-কুবরাতে(৮৯৫১) নাসাঈ]

কখনো কখনো নবীজি ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কে “হে ‘আয়িশু!”(عَائِشُ) বলে সম্বোধন করতেন। কখনো বা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর বোনের ছেলের নাম দিয়ে নবীজি ﷺ তাঁকে 'উম্মু আব্দুল্লাহ' (عبد الله - আব্দুল্লাহর মা) উপনামে ডাকতেন।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম ও রাখতেন।

জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রথম নাম ছিল বাররা। নামটির মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রশস্তির ভাব বিদ্যমান থাকায় তাতে নবীজিﷺ অশুভ ও অকল্যাণের ইঙ্গিত দেখে তা বদলে আদুরে নাম জুওয়াইরিয়া রেখে দেন, যেহেতু জুওয়াইরিয়ার বয়স কম ছিল। জুওয়াইরিয়া অর্থ-ছোট্ট, ছোট্ট বালিকা। (আল ইসাবা৪/২৬৬)

কাজি 'আইয়্যায রহিমাহুল্লাহ বলেন,
“এভাবে উপনাম দিয়ে তিনিﷺ তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার প্রকাশ করতেন।”

উপনামে ডাকার মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে
সুন্দর নামে ডাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে।স্ত্রীদের কোমল আচরণ করা ও তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা সুন্নাহ।

নবীজি ﷺ স্ত্রীদেরকে সময় দিতেন

নবীজি ﷺ শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর স্ত্রীদেরকে প্রতিদিন সময় দিতেন,তাঁদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে সব স্ত্রীদের রুমে যেয়ে সালাম দিতেন কুশল বিনিময় করতেন।

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর রাসুলﷺ ফজরের সালাত শেষে তাঁর জায়গায় বসে থাকতেন এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত লোকেরা তাকে ঘিরে থাকত। (সূর্য উঠলে) তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিয়ে দুআ করতেন। এরপর তিনি, সে-দিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা থাকত, তাঁর ঘরে গিয়ে থাকতেন।"
[আল-মুজামআল-আওসাতে(৫২১৬)তাবারানি]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এটিই ছিলো সকালের প্রথম কাজ।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
"নবীজিﷺ (ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত) সালাত পড়তেন। এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। নাহলে জামাআতের সময় হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।"
[সহিহ বুখারী ১১৬৮]

রাতের বেলায় কখনো কখনো স্ত্রীগণ এক ঘরে সমবেত হতেন। রাসুলﷺ তাদের কাছে এসে একত্রে সময় কাটাতেন। কথা বলতেন।

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলﷺ-এর নয় জন স্ত্রী ছিল। সবার পালা ভাগ করা ছিল। নয় দিন শেষ হওয়ার পূর্বে প্রথম স্ত্রীর পালা আসত না। যেদিন যে স্ত্রীর পালা থাকত, সেদিন রাতে অন্য সকল স্ত্রী তার ঘরে এসে সমবেত হতেন। '
(সহিহ মুসলিম: ১৪৬২)

হাজারো ব্যস্ততা ও দায়িত্বের বিশাল বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে খোশগল্প করতেন। সময়নুযায়ী তাদের সাথে মিলিত হতেন।

স্বামীকে অবশ্যই একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। তার কথা শুনার জন্য।
আজকাল স্বামীরা স্ত্রীদের সময় কি দিবে, টিভি কিংবা ফোন নিয়ে ই তাদের সময় পার করে। অফিস থেকে এসে ফ্রেশ হয়েই এসব নিয়ে বসে পড়ে। কখনো কখনো অফিসের কাজ বাসায় আসলেও করে। অথচ স্ত্রী সারাদিন সংসারের কাজ করে স্বামীর অপেক্ষায় থাকে। কখন আসবে,এসে তার সাথে কথা বলবে,তার কথা শুনবে। পরিশেষে দেখে স্বামী অফিসের কাজ শেষ করে এসে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থাকে কিংবা ফোন,টিভি নিয়ে বসে থাকে। স্ত্রীর দিকে মনোযোগ আর দেয়া হয় না। এভাবে দিন চলতে থাকলে একসময় দেখা যায় পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। স্বামী স্ত্রীর যে মধুর সম্পর্ক তা নষ্ট হয়ে যায়।

নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে খেলতেন এবং গল্প করতেন।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুযোগ পেলে স্ত্রীদের সাথে খুনসুটি করতেন গল্প করতেন। বিভিন্ন কথা বা কাজের মাধ্যমে উম্মুল মু'মিনীনদের হাসাতেন।
স্ত্রীদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন,কখনো তিনি বিরক্ত বোধ হতেন না।

এক রাতে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজিকেﷺ উম্মে জারের গল্প বলছিলেন। একবার এগারোজন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল। তারপর প্রত্যেকেই তার স্বামী সম্পর্কে বলল। উম্মে জার তার স্বামীর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার বর্ণনা দেওয়ার পর দেখা গেল, তদের মধ্যে তার স্বামীই সর্বোত্তম ছিল। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "আল্লাহর রাসুল আমাকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে তেমন, যেমনটা ছিল আবু জার উম্মে জারের কাছে।" [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫১৮৯]

স্ত্রীদের সাথে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলাও করতেন।

- আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, "আমি এক সফরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমি অল্প বয়সের ছিলাম এবং আমার শরীরে চর্বি (ভারী) ছিল না। নবীজী(ﷺ) সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা আগে যাও।' সাহাবীরা আগে চলে গেলেন। এরপর নবীজীﷺ আমাকে বললেন, 'এসো, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি।' আমি তাঁর সাথে দৌড় দিলাম এবং জিতে গেলাম। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলো, এবার তিনি জিতে গেলেন এবং বললেন, 'এটি আগের সেই জয়ের বদলা।'

  [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৬২৩৯]

এখনকার পুরুষরা ভাবে এসব মেয়েদের ন্যাকামো। স্ত্রীর সাথে খেলবে কি তার গল্প কি শুনবে,এসব করার আগেই স্ত্রীদের উপর একটা বিরক্তি প্রকাশ করে যখন স্ত্রী স্বামীকে কিছু বলতে আসে। বিভিন্ন অযুহাত দিয়ে দূরে রাখে। কাজের জন্য সময় পায় স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় পায়না। পুরুষরা চাইলেই পারে কাজের মধ্যে স্ত্রীকে এক মিনিট হলেও সময় দিতে। এই এক মিনিট স্ত্রীকে সময় দেয়ার ফলে স্ত্রী যে কতটা খুশি হয় তা হয়ত পুরুষ মানুষ জানেনা।
অন্যদিকে স্ত্রীকে ও বুঝতে হবে স্বামী যখন অনেক ক্লান্ত থাকে তখন তার সেবা করা। মেজাজ খারাপ থাকলে অযথা অনর্থক কথাবার্তা না বলা।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না

স্ত্রীদের প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ﷺ বিভিন্ন সময় কথা, কাজে স্ত্রীদের প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করতেন কোমলতার সঙ্গে। কেউ কাউকে ভালোবাসলে তা প্রকাশ করে দেয়া সুন্নাহ।

নবীজিﷺ সবার সামনে তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু যখন নবীজিকে ﷺ জিজ্ঞেস করেন, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "আয়িশা!"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৬৬২)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই।

হাদীসে উম্মে জার নামক একটি লম্বা হাদীস আছে, যা ইমাম বুখারীও সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আবু জার তার স্ত্রী উম্মে জার তার জন্য যেমন ছিলেন, আমিও তোমার জন্য তেমন। অর্থাৎ আবু জার উম্মে জার কে যেমন ভালোবাসত ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, আমিও তোমাকে তেমন ভালোবাসি ও ততটুকু কৃতজ্ঞ। তখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি আবু জার এর চাইতেও উত্তম। (সহিহ বুখারী,হাদিস নং ৫১৮৯)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা কে এতই মুহাব্বত করতেন যে,খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা জীবিত থাকা অবস্থায় আর কোন বিবাহ করেননি এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর কথা স্মরণ হলে কান্না করতেন,যখন ইচ্ছে প্রশংসা করতেন। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা এর বান্ধবীদেরও দেখভাল করতেন।

রাসুল ﷺ খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেন,"তাঁর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন।" (মুসলিম-২৪৩৫)

বর্তমান সময়ের পুরুষদের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাদের অবস্থা কেমন। তারা বউয়ের প্রশংসা কি করবে একটু দোষ পেলেই বউকে বকাঝকা মারধর শুরু করে দেয়। প্রথম বউ মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম বউয়ের নিন্দা করা শুরু করে দেয় দ্বিতীয় বউয়ের কাছে।

পুরুষ মানুষ সহজে ভালোবাসা প্রকাশ করে না। অনেকে তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাকে বেমানান ও অপুরুষোচিত মনে করে। ভালোবাসা প্রকাশ করা রাসুল

ﷺ এর সুন্নাহ। এই সুন্নাহ সম্পর্কে অনেকে জানে তারপরও তারা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। বছরের পর বছর চলে যায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোন মধুর বাক্য বিনিময় হয় না।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করা এমন এক কাজ, যার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক মমতাপূর্ণ ও শক্তিশালী হয় এবং সুখী পারিবারিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়।

ঘর থেকে বের হওয়া সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন

ইসলামে দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত রোমান্টিক আচরণ করতেন এবং নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্ত্রীকে চুমু দেয়া এটি ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি বহিঃপ্রকাশ এতে স্বামী স্ত্রী মধ্যকার ভালোবাসা আরও গভীর হয়।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে রোযা অবস্থায় কিংবা অযু করে এসে নামাজে যাওয়ার পূর্বে চুমু দিতেন। কখনো বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ও দিতেন।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

- "নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখা অবস্থায় (স্ত্রীদের) চুম্বন করতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তবে তিনি নিজের আবেগকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।"

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯২৭

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১০৬]

অনেক মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, মূলত এখানে বয়সের চেয়ে কারো উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাব্যতা দেখে হুকুম নির্ধারণ হবে। সাধারণত বৃদ্ধ লোকের উত্তেজিত হওয়ার

সম্ভাবনা না থাকায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে আর যুবককে নিষেধ করা হয়েছে; যেহেতু যুবকদের শারীরিক উত্তেজনা প্রবল থাকে। তবে কেউ যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যপারে আত্মবিশ্বাস রাখে তবে তার জন্য জায়িজ। -সম্পাদক

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

- "নবীজি ﷺ তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করে অজু না করেই নামাজে যেতেন।"

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৮৫]

নবীজি (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের বিদায় জানিয়ে চুমু খেতেন বা আদর করতেন। এটি স্বামীর জন্য সুন্নাহ।

স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে খাওয়াতেন

স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে দেয়া সুন্নাহ।
হাদিসে আছে স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে খাওয়ানো স্ত্রীর মন জয় করা সাদাকা। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে প্রতিদান ও পাওয়া যাবে ইংশাআল্লাহ।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
নবীজিﷺ বলেছেন:-

- "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু খরচ করবে, তার প্রতিদান তুমি পাবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে, তার জন্যও তুমি প্রতিদান পাবে।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৫৬, ১২৯৫

সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১৬২৮)

স্ত্রী যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, একই স্থানে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুখ লাগিয়ে পান করতেন:-

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হায়েয (ঋতুস্রাব) অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে রাসুল ﷺ -কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনিও ﷺ পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি হায়েয অবস্থায় হাড় চুষে তা রাসুল ﷺ -কে দিলে, আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম, তিনিও ﷺ সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।" (সহিহ মুসলিম - ৩০০)

এই ছোট ছোট বিষয় গুলা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর এমন আচরণে একদিকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আরেকদিকে স্ত্রী ও এমন আচরণে অনেক খুশি হয়, বুঝতে পারে স্বামী তাকে কতটুকু ভালোবাসে। ভালোবাসা প্রকাশ করার মাধ্যম ও বলা যেতে পারে।

স্ত্রীর ঘরের কাজে সাহায্য করা

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন,কখনো কাউকে কাজের জন্য হুকুম দিতেন না। ঘরে এসে নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন,কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘর ও ঝাড়ু দিতেন।

হাদিসে আছে,"নবীজি ﷺ নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন,ভেড়ার দুধ দোয়াতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যে-সব কাজ করে,সেগুলো করতেন।" (তিরমিজি -১১৩)

আসওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলেন, "নবীজি ﷺ ঘরে কী করতেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তিনি পরিবারের কাজকর্মে সহায়তা করতেন। এরপর যখন নামাজের সময় হতো, তখন তিনি নামাজের জন্য বেরিয়ে যেতেন।"(সহিহ বুখারী-২৯৭)

পুরুষ যেমন বাইরে কাজ করে নারীও তেমন সারাদিন ঘরের কাজ, বাচ্চা সামলানো সব করে। কিছু পুরুষ ভাবে নারী ঘরে কাজ করে এ তেমন কঠিন কাজ না। অথচ নারীও যে, সারাদিন কাজ করে খাবারের সময় পায় না এ খেয়াল কেউ রাখে না। উল্টো পুরুষ ঘরে এসে প্রশ্ন করে সারাদিন কি কাজ করো!? কখনো বা এত কাজ করার চাপ দেয় যা একজন নারীর পক্ষে করা খুবই দুষ্কর হয়ে যায়! একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই পারে স্ত্রীর কাজে সাহায্য করতে। পুরুষ মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজে নিজে করলেও স্ত্রীর জন্য কিছু টা ইহসান হয়।
রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ হলো ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা। বিশ্ব নেতা, মহান একজন নেতা,যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দিয়েছেন এক বিরাট দায়িত্ব। যিনি সৃষ্টির সেরা মানুষ, এমন একজন মানুষ,যিনি নিজের কাজ নিজে করতেন। কখনো স্ত্রীকে হুকুম করতেন না কোন কাজ করার জন্য। কিন্তু এখনকার পুরুষ মানুষ সামান্য পানি এনে না দিলে স্ত্রীকে বকাঝকা,কখনো বা মারধর ও করে। নিজের কাজ নিজে করতে লজ্জাবোধ করে। অসুস্থ স্ত্রীর ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার করে। এমন আচরণ অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ﷺ নির্দেশের পরিপন্থী।

স্ত্রীর কোলে হেলান দিয়ে তিলাওয়াত করা

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,‘আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকলেও নবীজিﷺ আমার কোলে ঠেস দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।’(সহিহ বুখারী:৩৬৭২)

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর স্বামীদের যেমন স্ত্রীদের উপর ন্যায়সংগত অধিকার, সেভাবে তাদের অধিকার রয়েছে স্বামীদের ওপর।

(সুরা বাকারাহ আয়াত: ২২৮)

স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রতি অধিকার আছে তেমনি স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি অধিকার আছে। স্ত্রীর প্রতিটি বিষয়ে দেখভাল করা স্বামীর দায়িত্ব। বিয়ের মোহর আদায় করা থেকে শুরু করে যতদিন এই বন্ধন থাকে ততদিন পর্যন্ত সব বিষয়ে স্বামীর দায়িত্বে থাকবে।

মুআবিয়া ইবনে হাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের ওপর স্ত্রীদের কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, নিজে যখন খাবে তাকেও খাওয়ানো, নিজে যখন পরিধান করবে তাকেও পরিধান করানো, তার চেহারায় আঘাত না করা, তাকে ঘৃণা না করা, ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাকে ছেড়ে না আসা।

(মুসনাদে আহমাদ:৪৪৭/৪)

- *স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।*
- *স্ত্রীর বিছানার হক আদায় করা।*
- *স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করা। তার দোষত্রুটি ক্ষমা করা।*
- *উচ্ছৃঙ্খল, দ্বীনবিরোধী চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।*
- *সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। ধমক না দেওয়া। রাগ না করা।*
- *স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এমন বিষয়ে সংযত থাকা।*
- *স্ত্রীর প্রতি কুধারণা না করা। স্ত্রীর প্রতি উদাসীন না থাকা।*
- *স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।*

- *নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া।*
- *জরুরি হয়ে পড়লে শরিয়তসম্মতভাবে উত্তম পন্থায় তালাক দেওয়া।*
- *খাওয়ানো ও পরিধান করানো।*
- *তাকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া এবং সে তা শিখতে চাইলে এর গুরুত্ব দেওয়া।*
- *তার অনুভূতির বিষয়ে সচেষ্ট থাকা।*
- *সতিত্ব রক্ষা করা ও তার যৌন বাসনা মেটাতে তার ডাকে সাড়া দেওয়া।*
- *স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়া ও তার সাথে সদয় আচরণ করা।*
- *তার গোপন বিষয় তালাশ না করা এবং তার ওপর গোয়েন্দাগিরি না করা।*
- *সে কষ্ট দিলে সহ্য করা এবং ধৈর্য ধরা।*
- *তার নির্দিষ্ট সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।*
- *স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।*
- *তাকে ঘরের বাইরে ছেড়ে না আসা।*
- *একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদের পালা বণ্টন করা।*
- *বিচ্ছেদের সময় তার সন্তানদের দেখাশোনা করা।*

- *ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সময় সরে যাওয়া।*

- *স্ত্রীর জন্য সাজুগুজু করা।*

- *স্ত্রীর চেহারায় আঘাত না করা।*

- *তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে থাকতে দেওয়া।*

- *যদি উত্তমরূপে তার সাথে সংসার করা সম্ভব না হয়, তাহলে ন্যায়সংগতভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া।*

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদীসে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কী কী হক রয়েছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো মানুষ অপর মানুষকে সিজদা করতে পারবে না। যদি তা জায়েয হতো, তাহলে আমি স্ত্রীদের আদেশ করতাম তারা যেন আপন স্বামীকে সিজদা করে। তাদের ওপর স্বামীর হোক এত বেশি।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰ يٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিণী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।"(সুরা রূম আয়াত:২১)

- স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।

- শরিয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা। গুনাহ এবং শরিয়তবিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো।

- প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি না করা।

- স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া। তবে অনুমতি দিয়ে রাখলে বারবার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

- পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা।

- কারও কাছে স্বামীর বদনাম, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা।

- স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।

- স্বামীর সম্পদ থেকে অনুমতি ছাড়া কাউকে কোনো কিছু না দেওয়া।

- স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামাজে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোজা না রাখা।

- মোটকথা শরিয়তবিরোধী না হলে আর শরিয়সম্মত ওজর না হলে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
“নারী যদি (দৈনিক) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, (রমযান) মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে,তাহলে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।”(মুসনাদে আহমাদ:১৯১/১)

আল্লাহ নারীদের জন্য কতটা সহজ করে দিয়েছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করার পাশাপাশি যদি স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে জান্নাতের সকল দরজা খুলে যাবে। সুবহান আল্লাহ!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের 'পোশাক' (পোশাকস্বরুপ) হিসেবে তুলনা করে অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ একটি উপমা দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে আছে,

তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।"

(সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৭)

পোশাকের উপমায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তিগুলো হলো:-
গোপনীয়তা রক্ষা,সুরক্ষা ও আশ্রয়,সৌন্দর্য ও প্রশান্তি,ঘনিষ্ঠতা।
পোশাক আমাদের লজ্জাস্থান ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। কেউ তা দেখতে পায় না তেমনি স্বামী স্ত্রীর একে ওপরের দোষ ত্রুটি কারো সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়।
শীতকালে কিংবা গরমকালে আমাদের পোশাকে ভিন্নতা আসে। স্বামী স্ত্রীর ও একে ওপরকে বিপদে আপদে সুরক্ষা করতে হবে আশ্রয়কেন্দ্র হবে। একে ওপরকে সম্মান করবে।
পোশাক পড়ার মাধ্যমে আমাদের একেক সময় একেক রকম দেখা যায়। আমাদের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। নিজেকে দেখে প্রশান্তি পাই। তেমনি স্বামী স্ত্রী একে ওপরের চক্ষু অন্তর শীতলকারী হয়ে উঠতে হবে। স্বামী স্ত্রীর কাছে স্ত্রী স্বামীর কাছে এসে যেন প্রশান্তি পায় নিজেদেরকে ওরকম ভাবেই উপস্থাপন করতে হবে।
পোশাক মানুষের শরীরের একদম কাছাকাছি থাকে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক টাও এতটাই কাছাকাছি। আবেগ মায়া মুহাব্বত সবকিছুর দিক থেকে যেন সবচেয়ে নিবিড় ও আত্মিক হয়।

তাই স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করা অপরিহার্য। আমাদেরকে রাসুলের ﷺ অনুসারীদের মধ্যে থাকতে হবে। তাহলেই সংসার হয়ে উঠবে সুখময় ইংশাআল্লাহ।

স্ত্রীর খেলাধুলা

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,
তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, আর এ সময় আমার ঘরে একটা পর্দা ঝোলানো ছিল। বাতাসের কারণে পর্দার এক কোনা খুলে যাওয়ায় আমার খেলার পুতুলগুলো, যা একটি তাকের ওপর ছিল, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। তখন তিনি ﷺ বলেন, হে আয়িশা! এগুলো কী? তিনি ﷺ বলেন, এগুলো আমার পুতুল। এরপর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখতে পান, যার কাপড় দিয়ে তৈরি দুটি ডানা ছিল। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী, যা আমি দেখছি? তিনি বলেন, এটা ঘোড়া। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর ওপর এটা কী? তিনি বলেন,তার দুটি ডানা। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া? আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনি কি শোনেননি, সুলায়মান আলাইহিস সালামের ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ওঠেন, যার ফলে আমি তাঁর সামনের দাঁত স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। [সুনানে আবু দাউদ,হাদিস নং ৪৮৫০]

মদিনায় আগমনকারী হাবশা (বর্তমান ইথিওপিয়া) অঞ্চলের কিছু লোক বর্শা ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তাদের রণকৌশল ও ক্রীড়া কসরত প্রদর্শন করছিল, উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাদের খেলা থামাতে চাইলে রাসুল ﷺ তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, "হে বনী আরফেদা (হাবশিদের উপাধি), তোমরা খেলতে থাকো।"

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু খেলার সাথিও ছিল। যখন রাসুল ﷺ আমার ঘরে আসতেন, তারা আড়ালে চলে যেত। রাসুল

ﷺ তাদের আবার আমার কাছে নিয়ে আসতেন। আমরা আবার আগের মতো খেলতে থাকতাম। '[সহিহ বুখারী:৬১৩০]

স্ত্রীদের নিয়ে খেলা দেখতে যেতেন

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “একবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে ছিলেন, এমন সময় বাইরে শিশুদের কণ্ঠ ও কোলাহল শুনতে পেলাম আমরা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম দেখলেন, কিছু হাবশি তাদের বল্লম নিয়ে খেলছে। তিনিﷺ আমাকে ডেকে বললেন,আয়িশা এদিকে আসো, দেখে যাও,আমি এগিয়ে আসলাম। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ নিয়ে আমি বালকদের খেলা দেখতে লাগলাম। একটু পর তিনি বললেন, “খেলা দেখা হয়েছে? তুষ্ট হয়েছে?” আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে আমার মর্যাদা কতটুকু তা জানতে চাইলাম, তাই বললাম, “না”। [সুনানুত তিরমিজি - ৩৬৯১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি খেলারত বালকদের দেখছিলাম আর রাসুল ﷺ -এর উদ্দেশে একটু পর পর বলছিলাম, "আল্লাহর রাসুল, তাড়াহুড়ো করবেন না।" তিনি আমার কথামতো দাঁড়িয়ে রইলেন একটু পর বললেন, “হয়েছে?” আমি আবারও বললাম, "তাড়াহুড়ো করবেন না।” আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'খেলা দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমি চাচ্ছিলাম, রাসুলﷺ -এর মনে আমার কতটুকু সমাদর ও সম্মান রয়েছে, সে কথা অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে পৌঁছাক।' [আস-সুনানুল কুবরা-৮৯৫১]

দাওয়াতে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলﷺ-এর এক ফারসি (বর্তমান ইরানি) প্রতিবেশী ছিল। ভালো স্যুপ রান্না করতে পারত সে। একদিন স্যুপ রান্না করে সে রাসুলﷺ-কে দাওয়াত দিতে আসলো। রাসুলﷺ তখন বললেন, "আয়িশাও?” সে

জবাব দিল, "না।" রাসুলﷺ বললেন, "তাহলে আমিও না।" লোকটি আবারও দাওয়াত দিল। রাসুল আবারও বললেন, "আয়িশাও?" লোকটি উত্তর দিল, "না।" রাসুলﷺ বললেন, "তবে আমিও না।" তৃতীয়বার দাওয়াত দিলে রাসুলﷺ একই কথা বললেন। এবার লোকটি "হ্যা" বলল। এরপর তাঁরা দুজন হুড়মুড় করে উঠলেন। পরস্পরকে অনুসরণ করে চলতে চলতে উপস্থিত হলেন সে ফারসির বাড়িতে। (সহিহু মুসলিম: ২০৩৭)

স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন

আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (রহঃ) এবং ওয়াহব ইবনু জারীর (রহঃ) শু'বাহ (রাঃ) হতে 'তা ফরয গোসল ছিল বলে বর্ণনা করেছেন।

(আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৭, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ২৬২)

"নবীজি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাইমুনা রাদিআল্লাহু আনহা একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।" (সহিহ বুখারি:২৫৩)

অন্য এক হাদিসে আছে,আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি ও রাসুলﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। কখনো তিনি আমার আগে পানি নিয়ে নিতেন। কখনো আমি তাঁর আগে পানি নিতাম। এমনকি তিনি বলতেন, "আমার জন্য রাখো।" আমিও তাকে বলতাম, "আমাকে নিতে দিন।"

(সহিহ বুখারি:২৫০)

স্ত্রীকে প্রহার না করা

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া কখনো কোনো জিনিসকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। কোনো নারী (স্ত্রী) বা সেবককেও না। কখনো কেউ তাকে আঘাত করলে তিনি প্রতিশোধ নেননি। তবে যদি আল্লাহর হারামকৃত কোনো জিনিস লঙ্ঘন করা হতো (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ করে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)। [সহিহ মুসলিম :২৩২৮)

আসিম আবাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "'যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে,তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়।'কথার অর্থ হলো,যারা স্ত্রীদের প্রহার,করে তারা উত্তম নয় বরং যারা ধৈর্যসহকারে স্ত্রীদের খারাপ বা ভুল আচরন সহ্য করে এবং তাদের প্রহার করা থেকে বিরত থাকে,তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

(আওন আল-মা'বুদ(১৩০/৬)

তবে শরীয়তবর্হির্ভূত কাজ দেখা গেলে কুরআন এবং হাদিসে যা বলা আছে তা করা যাবে।

উমার রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসুলেরﷺ কাছে এসে বললেন, 'নারীরা তাদের স্বামীদের সাথে অনেক উদ্ধত হয়ে উঠেছে।' তখন তিনি তাদের সামান্যভাবে আঘাতের অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা রাসুলুল্লাহরﷺ স্ত্রীদের কাছে এসে (স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে) অভিযোগ করতে লাগল। তিনি শুনে বললেন, "অনেক মহিলা মুহাম্মাদেরﷺ স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়।"

(আবু দাউদ:২১৪৬)

স্ত্রীর ভালো গুন দেখা

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো ঈমানদার পুরুষ যেন কোনো ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।

(সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯)

স্ত্রীর অনূভুতির প্রতি খেয়াল রাখা

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।” আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইবরাহীম আলাইহিস সালাম - এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি(তবে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসায় কমতি আসে না)।(সহিহ বুখারী:৫২২৮)

(আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৮)

নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ গ্রহণ করো। কারণ, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা অংশটি হলো তার ওপরের দিক। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি তা তার

অবস্থাতেই ছেড়ে দাও, তবে তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৩১)

ইসলামিক স্কলারদের মতে, এই হাদিসে 'পাঁজরের বাঁকা হাড়' দ্বারা নারীদের স্বভাবজাত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে রূপক হিসেবে বোঝানো হয়েছে। এটি কোনো ধরনের ত্রুটি বা অবমূল্যায়ন নয়, বরং নারীদের কোমলতা ও আবেগের প্রতি ইঙ্গিত করে।

হাদিসে দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমেও এবং শেষের দিকেও বলেছেন স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করার কথা। নারীদের স্বভাবজাত তারা নরম, কোমলতা এবং আবেগী হয়। তাদের সাথে শক্ত ভাবে কথা বললে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "একজন মুমিন কখনোই যেন একজন মুমিন নারীকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার কোনো কিছু অপছন্দ করে, তবে তার এমন গুণও তো রয়েছে যা সে পছন্দ করে।"

(সহিহ মুসলিম :২৬৭২)

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এর অর্থ হলো, তার ঘৃণা করা অনুচিত; কারণ, স্ত্রীর মাঝে যেমন তার অপছন্দনীয় বিষয় আছে, তেমনি এমন অনেক গুণও আছে, যা তার পছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা হয়তো অনেক রূঢ়ভাষী, কিন্তু একই সাথে সে অনেক দ্বীনদার, সতী-সাধ্বী।”

বিদায় হজের মতো গুরুত্ববহ খুতবার একটি স্বতন্ত্র অংশজুড়ে আছে নারীদের অধিকারসম্পর্কিত আলোচনা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সাবধান, “তোমরা নারীদের (প্রতি সদাচরণের) ক্ষেত্রে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। তারা তোমাদের অধীনস্থ। এ ছাড়া তাদের ওপর তোমাদের কোনো অধিকার নেই।”

(সুনানুত তিরমিজি : ১০৮৩)

রাসুল ﷺ প্রায়ই এই নির্দেশনা দিতেন সাহাবিদের। কেননা, তিনি ভালো করে জানতেন নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি-যা অনেক সময় পুরুষরা সহ্য করতে পারে না। নারীদের

অসংলগ্ন কর্মকাণ্ডে অনেক সময় পুরুষরা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাদের তালাক দিয়ে বসে। চোখের পলকে ভেঙে যায় কত বৈবাহিক বন্ধন, টুকরো টুকরো হয়ে যায় কত পরিবার।

তাই রাসুলুল্লাহ উম্মতের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যাবলি এড়ানোর পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মুমিন স্বামী তার স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। কেননা, একজন মুমিনার চারিত্রিক কোনো দিক যদি তার অপছন্দ হয়ও; অন্য আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে সন্তুষ্ট করবেই। (সহিহ মুসলিম:২৬৭২)

মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা করা স্বামীর উচিত নয়। মানুষের চরিত্র দিক থেকে কোন না কোন ত্রুটি থাকে যদি তা ইসলাম বিরোধী না হয় তাহলে স্বামীর উচিত তা উপেক্ষা করে স্ত্রীর ভালো গুন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। যথাসম্ভব চেষ্টা করা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তার যে দিকটা স্বামীর অপছন্দ সে দিকটা বদলে ফেলা।

নারীকে যেহেতু বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই বেশি সোজা করতে চাইলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে সংসারে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। নারীকে বুঝাতে হবে শান্ত নরম স্বরে কথা বলে কোমল আচরণ করে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'
(সুরা আন-নিসা আয়াত:১৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তার প্রতিটি বিষয় সুক্ষ্ম ভাবে আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন।

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর স্ত্রীর কাছে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম। '

(সুনানুত তিরমিজি :৩৮৯৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো নারীদেরকে প্রহার করতেন না। স্ত্রীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলেননি।

আরবদের মাঝে একটি প্রবাদ আছে- 'মর্যাদাবানরাই স্ত্রীদের সম্মান করে। ইতর শ্রেণির লোকেরাই স্ত্রীদের অসম্মান করে। সম্মানিত লোকদেরকে স্ত্রীরা জয় করে নেয়। আর ছোট লোকেরা স্ত্রীদের ছোট করে রাখে।'

স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা তাদেরকে অকারণে প্রহার না করা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ মতো সংসার পরিচালনা করলে দাম্পত্য জীবন হবে সুখময় ইংশাআল্লাহ।

স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী, আমি এতিম ও মহিলা-এই দুই শ্রেণির অধিকার (এবং এর সংক্রান্ত আহকাম) সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি।" [ইবনে মাজাহ:৩৬৭৮]

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,নবিজী ﷺ সুরা ফালাক ও নাস পড়ে জনৈক অসুস্থ স্ত্রীর গায়ে ডান হাত বুলিয়ে দো'য়া করলেন-

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।" (সহিহ বুখারী-৫৭৪৩)

অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের স্বান্তনা দিতেন

হজের সময় আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হায়েজ শুরু হল এ কারণে তিনি কাঁদছিলেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

আনহা কেঁদে চলেছেন, জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে হায়েজ শুরু হয়েছে। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন “জি”।
রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এতে কাঁদার তো কোনো কারণ নেই। আল্লাহ এটি প্রত্যেক আদম কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তুমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হজের বাকি আমল গুলো করতে থাকো।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম, যারা তামাত্তুর নিয়্যত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু নেয়নি। তিনি বলেনঃ তার হায়েয শুরু হয় আর আরাফা এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হননি। ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজ্জের সঙ্গে উমরারও নিয়্যত করেছি। আল্লাহ্‌র রাসুল (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ মাথার বেণী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা হতে বিরত থাক। আমি তাই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর আল্লাহ্‌র রাসুল (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুর (রহঃ) কে ‘হাসবায়’ অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করানোর) নির্দেশ দিলেন। তিনি তানঈম হতে আমাকে ‘উমরা করালেন, যেখান হতে আমি ‘উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।(সহিহ বুখারী:৩১)

স্ত্রীর পরিচিত মানুষদের সাথে উদার আচরণ করতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, "নবীজিﷺ আমার ঘরে ছিলেন এমন একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' জবাব দিল, “আমি জাশশামা আল-মুযানিয়্যা।' তিনিﷺ বললেন, "বরং আপনি তো হুসসানা। কেমন আছেন? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন আছে? আপনি কী করছেন এখন? আপনাকে শেষবার দেখার পর আপনার দিনকাল কেমন কেটেছে?'
সে চলে গেলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ালু ব্যবহার করলেন কেন?' নবীজিﷺ জবাব দিলেন,

“আয়িশা,খাদিজা বেঁচে থাকতে সে আমাদের বাসায় আসত। আর পুরনো বন্ধুদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরন করা তো ভালো ঈমানের লক্ষণ।”

(হাকিম নাসাঈ ১৭/১)

স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'আমার ওপর আল্লাহর অন্যতম মেহেরবানি হচ্ছে, রাসুল ﷺ আমার ঘরেই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি আমার পালায় ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর ও আমার মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। (সেদিন) আব্দুর রহমান আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। রাসুল ﷺ আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনিﷺ আব্দুর রহমানের হাতের মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম, তিনিﷺ মিসওয়াক করতে পছন্দ করেন। রাসুল ﷺ -এর কাছে জানতে চাইলাম, আমি কি মিসওয়াকটা নেব? মাথা নেড়ে তিনিﷺ সায় দিলেন। মিসওয়াক নিয়ে বললাম, "নরম করে দিই?" রাসুলﷺ আবারও মাথা নেড়ে সায় জানালেন। আমি দাঁত দিয়ে মিসওয়াকের আগা কেটে নিলাম, এরপর চিবিয়ে নরম করে রাসুলﷺ-কে দিলাম। তিনিﷺ আমার বুকের ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় মিসওয়াক করলেন। ' (সহিহ বুখারী:৪৪৩৮)

দুঃখ-কষ্টে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েও স্ত্রীদের পরামর্শ নিয়েছেন। যেমন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা উঠো এবং কুরবানী করো ও মাথা কামিয়ে ফেলো। (রাবী বলেন) আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুলﷺ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে সাহাবায়ে কেরামের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি চান, তাহলে আপনি বাইরে

যান ও তাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানি করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। তার কথা অনুযায়ী নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গেলেন এবং কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানি দিতে এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানি দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভিড়ের কারণে একে অপরের ওপর পড়তে লাগলেন। (তাফসীরে তাবারী:২/২৯৩)

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুতেন

নবীজির ﷺ আরেক স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, "একবার এক পশমি চাদরের নিচে আমি নবীজির ﷺ সঙ্গে শুয়ে ছিলাম; সে-অবস্থায় আমার মাসিক শুরু হলো। চাদর থেকে আস্তে করে বের হয়ে আমার মাসিকের কাপড় পরলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ঋতুস্রাব হয়েছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি আবার চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।"(সহিহ বুখারী:২৯৮)

নববী রাহ. বলেন, "সম্ভবত তিনি আশঙ্কা করছিলেন মাসিকের রক্ত হয়তো নবীজির ﷺ গায়ে লেগে যাবে, তাই আস্তে করে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এটিও হতে পারে যে, তিনি রক্ত আসায় বিরক্ত হয়ে কাপড় পরিবর্তন করে পরিষ্কার কাপড় পরার জন্য বের হয়েছিলেন।"(সহিহ মুসলিম:২০৭/৩)

নবীজির ﷺ স্ত্রী মায়মুনা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, "মাসিক অবস্থায়ও আল্লাহর রাসুলের ﷺ সাথে আমি শুয়ে থাকতাম এবং আমাদের মাঝখানে কাপড় থাকত।"(সহিহ মুসলিম:২৯৫)

অনেক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মাসিক অবস্থায় দূরত্ব বজায় রাখে এবং একসাথে ঘুমায় না পর্যন্ত। এটি রাসুলের সুন্নাহর পরিপন্থী। এটি মেয়েদের মানসিকভাবেও আঘাত দেয়। কারণ, মাসিকের সময় মানসিকভাবে মেয়েরা বিপর্যস্ত থাকে এবং খুব দ্রুত মানসিক

অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ-অবস্থায় স্বামী যদি তার থেকে দূরে থাকে, তবে সেটি তার জন্য আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাকে আরও বিষণ্ণ করে তোলে।

স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা এবং নিজেকে পরিপাটি রাখতেন

নবীজিﷺ এমনিতেই সুন্দর ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। সবসময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তবে স্ত্রীদের কাছে গেলে বিশেষভাবে নিজেকে সুন্দর-সুগন্ধিময় করে নিতেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-'ঘরে প্রবেশ করে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।

(সহিহ মুসলিম:৪৮৩)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে প্রথমে মিসওয়াক করতেন কারণ, দেখা যায় অনেক সময় মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মুখের ঘ্রাণ পাল্টে যায়।এরজন্য তিনি ঘরে ঢুকে মেসওয়াক করতেন যেন তাঁর জন্য অন্য কারো কষ্ট না হয়।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে মুখ দাঁত পরিষ্কার করে নিতেন। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,রাতে দিনে যখনই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠতেন,তখনই অজুর আগে মিসওয়াক করে নিতেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরও বলেন-
'আমি নবিজির চুলের সিঁথিতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ও মিশকের সাদা অবশিষ্টাংশ দেখেছি।

(সহিহ মুসলিম)

তিনি নিজের চুল আঁচড়াতেন। সাহাবাদেরকে বলতেন, যার মাথায় চুল আছে সে যেন তার সম্মান করে। অর্থাৎ চুলে তেল লাগিয়ে, পরিচ্ছন্ন করে, আঁচড়ে সুবিন্যস্ত রাখে।(সুনানে আবু দাউদ:৪১৬৩)

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,রাসুল (ﷺ) নিজ শরীর থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া খুবই অপছন্দ ও গুরুতর মনে করতেন।

সুগন্ধি ব্যবহার করা রাসুলﷺ এর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াতে তাঁর প্রিয় জিনিসগুলোর মধ্যে একটি ছিলো সুগন্ধি।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চুল আঁচড়ে রাখতেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইত্তেকাফ করতেন মসজিদ থেকে আমার কক্ষে থেকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় নিজেকে পরিপাটি রাখতে পছন্দ করতেন এমনকি সাহাবীদেরও এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। পরিছন্নতা ও পরিপাটি থাকা শরীয়তের পছন্দনীয় একটি বিষয়। তিনি উৎসাহ দিতেন মানুষ যেন পরিচ্ছন্নতার সুন্নাহগুলো যথাযথভাবে আদায় করে।

পুরুষদের উচিত নিজের স্ত্রীর জন্য নিজেকে পরিষ্কার রাখা সাজসজ্জা করে পরিপাটি থাকা।

স্ত্রীদের সাজসজ্জা সুযোগ দেওয়া

নবীজিﷺ সফর থেকে এসেই হুট করে ঘরে চলে যেতেন না। স্ত্রীদেরকে সাজগোজ করার সুযোগ দিতেন। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দিতেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'আমরা এক সফর থেকে মদিনায় ফেরার পর ঘরে যেতে উদ্যত হলে নবীজিﷺ বললেন-অপেক্ষা করো। স্ত্রীদেরকে সুযোগ দাও। রাতের দিকে ঘরে যেয়ো। স্ত্রীরা এর মধ্যে প্রস্তুতি নিতে পারবে।' (সহিহ বুখারি:৪৮৬৬)

স্ত্রীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন

উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা কুরাইশরা যখন মক্কায় ছিলাম, তখন আমরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব চালাতাম। কিন্তু মদিনায় এসে দেখলাম, আনসারি নারীরা পুরুষদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। আনসারি নারীদের দেখাদেখি আমাদের নারীরাও দেখি এখন পুরুষদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছে। একবার আমি কোনো ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ওপর একটু গলা চড়িয়ে কথা বলি। তখন আমার স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ফিরিয়ে দেয় এবং আমার সাথে বিতর্ক করে। এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো। তখন তিনি বললেন, "আপনি আমার আচরণে অবাক হচ্ছেন? আল্লাহর কসম, রাসুলﷺ-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে রাগ করে কথা বলেন। তাদের কেউ কেউ তো রাগ করে পুরো দিন রাসুলﷺ-এর সাথে কথা বলেন না।" তার কথায় আশ্চর্য হলাম আমি। আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে বললাম, "হাফসা, তোমাদের কেউ কি সকাল হতে রাত পর্যন্ত নবিজিﷺ-এর সাথে রাগ করে কথা বন্ধ করে রাখে?" তিনি বললেন, "হাঁ।" আমি বললাম, "তাহলে সে তো ধ্বংস! রাসুল ﷺ -কে রাগানোর কারণে তুমি কি আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে? তুমি তো ধ্বংস হয়ে যাবে!(সহিহ মুসলিম:৮৯)

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "এই রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, নারীদের সাথে কঠিন আচরণ করা নিন্দনীয়। কারণ, নবীজি ﷺ নারীদের সঙ্গে ব্যবহারে আনসারদের প্রথা মেনে নিয়ে তার নিজের লোকদের (কুরাইশ) প্রথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে ধৈর্যসহ আচরণ করা উচিত এবং তার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেওয়া উচিত; কিন্তু সেটি যদি আল্লাহর অধিকার হয়, তবে তা ভিন্ন কথা।"

(ফাতহুল বারি(২৯১/৯)

একবার আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এসে রাসুলুল্লাহﷺ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তখন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -কে নবীজিﷺ-এর সাথে জোর গলায় কথা বলতে শুনলেন। অনুমতি পেয়ে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু প্রবেশ করলেন। তারপর আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -কে "হে উম্মে রুমানের মেয়ে" বলে সম্বোধন করলেন এবং তাকে ধরে বললেন, "তুমি রাসুলুল্লাহﷺ-এর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছ!" তখন নবীজিﷺ তাদের বাপ-মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবু বকরকে

থামালেন। আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বের হয়ে গেলে নবীজিﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -কে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বললেন, "দেখলে কীভাবে তোমাকে ওই লোকের হাত থেকে বাঁচালাম?" কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আবার এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে এসে তিনি তাঁদের দুজনকে হাসতে দেখলেন। তাঁদের বললেন, "আল্লাহ রাসুল, আপনারা যুদ্ধের সময় আমাকে যেভাবে দলে নিয়েছিলেন, সন্ধির সময়ও দলে নিয়ে নিন!

(মুসনাদু আহমাদ:১৭৯২৭)

স্ত্রীকে সফরের সঙ্গী বানানো

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ، عَائِشَةَ، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً، مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, নবীজিﷺ বাইরে কোথাও যাবার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাঁকেই নবীজিﷺ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এতে আমার নাম আসল এবং আমি নবীজিﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনা।

(সহিহ বুখারি:২৮৭৯)

ভ্রমন করার সময় স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন

যখনই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাবার ইরাদা করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা - এর নাম লটারীতে ওঠে। নবীজিﷺ - এর রীতি ছিল যখন রাত হত তখন ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা - এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা - কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি। সে হিসাবে ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা - এর উটে এবং হাফসাহ রাদিআল্লাহু আনহা ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা- এর উটে সওয়ার হলেন। নবীজিﷺ ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজিﷺ – এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন ‘আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা নিজ পা দু’টি ‘ইযখির’ নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ - কে কিছু বলতে পারব না।

(সহিহ বুখারী:৫২১১)

সফরে ধীরে উঠ চালানোর নির্দেশ দিতেন

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলﷺ তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন আনজাশা নামক কালো এক কিশোর গান গেয়ে উট চালাচ্ছিল। (ফলে উটগুলো জোরে পা ফেলছিল) রাসুলﷺ তাকে বললেন, "আনজাশা, উট ধীরে চালাও, তুমি কিছু কাচপাত্র (মহিলা) সাথে নিয়ে সফর করছ।”

[সহিহুল বুখারী:৬১৬১]

আলিমগণ বলেন, 'রাসুলﷺ মহিলাদের কাচপাত্রের সঙ্গে উপমা দিলেন। কারণ, নারীদের ওপর কোনো কিছুর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। তারা কঠিন কিছুর ধকল সইতে পারে না।

স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন

উটে রাসুল ﷺ -এর খাদিম আনাস বলেন, 'আমি দেখলাম, সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা আরোহণের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছেন। এরপর উটের কাছে বসে হাঁটু উঁচু করে রাখছেন। সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা পা রেখে বাহনে চড়ছেন। '(সহিহ বুখারী: ২৮৯৩)

রাসুলﷺ-তাঁর হাঁটু দাঁড় করে রাখছেন আর সাফিয়া রাসুলﷺ-এর হাঁটুর ওপর পা রেখে বাহনে চড়ছেন। এটা রাসুলﷺ-এর বিনম্রতা, স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসার এক আশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ।

যিনি হচ্ছেন সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন। এমন একজন ব্যক্তি হাঁটু ওপর ভর দিয়ে স্ত্রী বাহনে উঠে। এই হাদিসটার মাধ্যমে বুঝা যায়, স্ত্রীদের মর্যাদা ঠিক কতটুকু এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
আমাদের শিক্ষক তো এমনি হওয়া উচিত যার প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে।

এখনকার পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে যে দাম্ভিকতা দেখায় তাদের উচিত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সীরাহ পড়া। তাহলে হয়তো তাদের এই দাম্ভিকতা ভেঙে যাবে। রাসুল ﷺ হচ্ছেন আমাদের আদর্শ।

স্ত্রীর রাগে নবীজির ﷺ আচরণ

কোন এক সময় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মুমিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবীজিﷺ অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবীজিﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর নিকট হতে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাঁর কাছে পাঠালেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার ঘরেই রাখলেন।

(আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৫)

(সহিহ বুখারী: ৫২২৫)

স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। (সহিহ মুসলিম:১৪৩৭)

স্ত্রীর প্রতি রাসুলুল্লাহﷺ-এর সহমর্মিতা

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ, এতিম ও নারী-এই দুই দুর্বলের অধিকার হরণ করা আমি হারাম ঘোষণা করছি।"(হাদিসটি সুনান ইবনু মাজাহ-তে (হাদিস নং ৩৬৭৮)

সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে,

“একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের নিয়ে হজের সফরে রওনা হন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বাহন থেকে নেমে উটগুলো হাঁকিয়ে চলল। উটগুলো দ্রুত চলতে শুরু করল। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “মহিলাদের নিয়ে সাবধানে চলো।” এভাবে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা- এর উট হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সাফিয়্যা রাদিআল্লাহু আনহা -এর উটটি সবচেয়ে সুন্দর ছিল। উটকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে তিনি কেঁদে উঠলেন। রাসুল ﷺ-কে জানালে তিনি এগিয়ে এলেন সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা -এর দিকে। সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা এর অশ্রু মুছে দিলেন নিজ হাতে।”

(মুসনাদু আহমাদ:২৬৩২৫)

খারাপ সময়ে স্ত্রীর নিন্দা না করা

গাযওয়াতু বানিল মুসতালিকে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যখন অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিন্দা করেননি। বরং ধৈর্য ধরেছেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন।

(সহিহ বুখারী:৪৩৫৮)

স্ত্রীদের খুনসুটি

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হারিরাহ রান্না করেছিলাম। হারিরাহ হলো-আটা, দুধ ও ঘি মিশ্রিত এক ধরনের খাবার। সে সময় আমাদের ঘরে সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা উপস্থিত ছিলেন। আমি হারিরাহ রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করলাম। সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বললাম, তুমিও গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি খেতে অনিহা প্রকাশ করলেন। এ কারণে আমি পাতিলে হাত দিয়ে সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা-এর চেহারায় তা মেখে দেই। এটা দেখে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসেন।

এ ব্যাপারে সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন- তুমিও আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর চেহারায় হারিরাহ মেখে দাও। সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাও পাতিলে হাত দিলেন এবং তা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -এর চেহারায় মেখে দিলেন।

এ ঘটনা দেখে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মুচকি হাসেন। সে সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে আসছিলেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়তো ভেতরে আসবেন। তাই তিনি বললেন যাও হাত-মুখ ধুয়ে আসো।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এই ধরনের নির্মল আনন্দ ও রসিকতা নিয়ে রাসুল ﷺ বলেন, ‘ইসলামে খেল-তামাশা নিষিদ্ধ হলেও তিনটি কাজ এর অন্তর্ভুক্ত নয়: ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ায় চড়া এবং স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ বা হাসি-ঠাট্টা করা।’

স্ত্রীদের প্রতি গায়রত

গায়রত' (আরবি: غَيْرَة) অর্থ আত্মমর্যাদাবোধ।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। যে মদ তৈরি করে। যে মাতা পিতা নাফরমানি করে। এবং দাইয়্যুস ব্যক্তি। দাইয়্যুস হলো সেই ধরনের মানুষ, যার স্ত্রী পরপুরুষের সাথে যেমন ইচ্ছে কথা বলে, যোগাযোগ রাখে সম্পর্ক রাখে এবং স্বামী কিছুই বলে না।

গায়রত বিষয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত প্রখর। নবীজির ﷺ গায়রত ছিল প্রবল।

একসময় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর দরবারে একজন হিজড়া ব্যক্তি আসা-যাওয়া করত। সকলে তাকে নারীর প্রতি আকর্ষণহীন মনে করত। একদিন

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর গৃহে প্রবেশ করে শুনলেন সে স্ত্রীদের কাছে এক নারীর দেহের বর্ণনা দিয়ে বলছে- যখন সে সামনে অগ্রসর হয় চার নিয়ে অগ্রসর হয়, আর যখন পেছনে ফেলে যায় আটটি নিয়ে ফিরে যায়। (অর্থাৎ খুব মোটা)

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! এত দেখছি এখনকার বিষয়াদি বোঝে। সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনো প্রবেশ না করে।

(সহিহ বুঝারী:৪৩২৮)

সবাই তাকে নারীর প্রতি আকর্ষণহীন মনে করেছিলেন। কিন্তু তার কথা শুনে নবীজিﷺ বুঝলেন তার আকর্ষণ রয়েছে নারীর প্রতি। আর যদি নাও থাকে তবুও সে যে পুরুষের অন্তরকে উত্তেজিত করে এমন ভাষায় নারীর বর্ণনা দিচ্ছে, সে যাতে অন্য কারো কাছে গিয়ে স্ত্রীদের বর্ণনা না দেয় এজন্য নবীজিﷺ নিষেধ করলেন যেন আর কখনো গৃহে প্রবেশ না করে।

অন্য আরেক হাদিসে বর্ণিত আছে,
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন আমি ও মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। ইতোমধ্যে অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই আমাদেরকে পর্দা করতে বললেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল!ﷺ তিনি তো অন্ধ! আমাদেরকে দেখছেন না! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না!

(মুসনাদে আহমাদ:৪/১৫৯ হাদিস)

একবার সাদ ইবনে উবাদা (রা.) বলেন, "আমার স্ত্রী বা পরিবারের সাথে অন্য কোনো পুরুষকে দেখলে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করব।" তখন রাসুল ﷺ তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধকে সমর্থন করে বলেন,"তোমরা কি সাদের গায়রতে আশ্চর্য হচ্ছ? অথচ আমি সাদের চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং আল্লাহ তা'আলা আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।"

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) সম্পন্ন এবং মুমিনও গায়রত সম্পন্ন। মুমিন যখন কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর গায়রত জন্মে।"

(সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস নং- ১১৬৯)

ইসলামে গায়রতহীন পুরুষকে 'দাইয়ুস' বলা হয়েছে। রাসুল ﷺ কঠোরভাবে বলেছেন, যে পুরুষ তার পরিবারের অশ্লীলতা দেখেও কোনো প্রতিবাদ করে না বা পরোয়া করে না, সে দাইয়ুস এবং দাইয়ুস জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

নবীজির ﷺ স্ত্রীর জন্য গায়রত কাজ করত, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অনুসরণীয়। আফসোসের কথা হলো, অনেক মুসলিম আজ ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গিয়েছে এবং নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য তারা প্রদর্শন করে বেড়ায়। এভাবে তারা মুসলিম-সমাজের অন্যদের মাঝেও গায়রতকে হালকা করে দিচ্ছে।

জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, “রাসুলুল্লাহﷺ (আমার ঘরে) এসে দেখলেন, দুই বালিকা বুয়াসের যুদ্ধে আনসারদের দুই গোত্রের (আউস ও খাযরাজ) কবিতা আবৃত্তি করছে। তিনিﷺ বিছানায় অন্যদিকে মুখ ঘুরে শুয়ে পড়লেন। তারপর আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এসে আমাকে বকা দিতে লাগলেন, “রাসুলুল্লাহরﷺ ঘরে শয়তানের যন্ত্র (কবিতা)! আল্লাহর রাসুলﷺ তার দিকে ফিরে বললেন, "ওদের ছেড়ে দাও।” এরপর তিনিﷺ আমাদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলেন। আমি তাদেরকে ইশারায় চলে যেতে বললাম। আর এটা ঘটেছিল ঈদের দিনে।” (সহিহ বুখারী:৯৫০)

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “এই রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, ঈদের দিনে পরিবারের আনন্দের ব্যবস্থা করা (নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু দিয়ে) এবং (রমাদানের সিয়াম ও দীর্ঘ রজনীর কিয়ামের) ইবাদাতের পর আরাম করা উত্তম। এ থেকে এটিও শেখা যায়, স্ত্রীদের ব্যাপারে নরম থাকা এবং তার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।”

ইবনে রজব রাহ. আরও বলেন, “রাসুলুল্লাহ ﷺ ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে দফ নামক বাদ্যযন্ত্রে ছাড় রয়েছে।”

রাসুল ﷺ স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি একবার রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশে বললাম, "আল্লাহর রাসুল ﷺ, মনে করুন, আপনি একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন আপনার উটকে খাবার খাওয়াবেন বলে। উপত্যকায় একটি গাছ আছে, যার পাতা খাওয়া। অন্য আরেকটি গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনি কোনটা থেকে উটকে খাওয়াবেন?” রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি।” আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এ কথার মাধ্যমে নিজেকেই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ কেবল তাকেই কুমারি অবস্থায় বিয়ে করেছেন।'

(সহিহ বুখারী:৫০৭৭)

আরেকবারের ঘটনা। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'বাকি কবরস্থানে একটা জানাজা ছিল। জানাজা থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ দেখলেন, আমি মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছি। আমি বলছিলাম, "ওহ! আমার মাথা!" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, “বরং মাথা ব্যথা আমার। তুমি যদি মাথা ব্যথায় মারা যাও, তবে তোমার তো কোনো কষ্ট নেই। সব কষ্ট তো আমাকেই করতে হবে। তোমাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে, এরপর জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে না!” আমি বললাম, “হাঁ, আপনি তো তা-ই চান। আমি মারা যাই, আর সেদিনই আপনি অন্য স্ত্রী আমার ঘরে এনে তার সাথে সময় কাটান।” রাসুল ﷺ আমার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এ ঘটনার কিছু সময় পরই রাসুল ﷺ -এর মৃত্যুর অসুস্থতা শুরু হয়।' (মুসনাদে আহমাদ:২৪৭২০)

স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো খাদিজা আপনার কাছে একটি পাত্র নিয়ে আসছেন, যার মধ্যে কিছু তরকারি, খাদ্য ও পানীয় আছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন তখন তাকে তার প্রতিপালকের এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন। আর তাকে জান্নাতের একটি গৃহের সুখবর দেবেন, যা এমন একটি মুক্তা দ্বারা প্রস্তুতকৃত, যার ভেতর উন্মুক্ত।(সহিহ বুখারী:৫০৭৯)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাঁর ওপরও শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক!

স্ত্রীদের প্রতি নবিজীﷺ উপদেশ এবং স্ত্রীদেরকে মুমিন নারীদের আদর্শ হিসেবে বিনির্মান

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, “আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন-সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কি না।এমনকি পুরুষকে তার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।” (নাসায়ি রহি.কৃত আস-সুনানুল কুবরা:৯১৭৪)

ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,'রাসুলﷺ বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক শাসিতের ওপর দায়িত্বশীল; তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল; তাকে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।(সহিহ বুখারি:৮৯৩)

প্রত্যেক দায়িত্বশীল পুরুষদের কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন,সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা! আল্লাহ পুরুষদের অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঘরের নারীদেরকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলা।স্ত্রীকে তালিম-তরবিয়াতের মাধ্যমে গড়ে তোলা স্বামীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে হাসি ঠাট্টা কৌতুক করা সত্ত্বেও রাসুলﷺ স্ত্রীদের তালিম-তরবিয়াতের প্রতি ছিলেন বেশ আগ্রহ ও সচেতন।
আমাদের সমাজে পুরুষ যদি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাহলে ঘর হয়ে উঠবে প্রশান্তির,ভালোবাসার এবং রহমতে পরিপূর্ণ একটি আদর্শিক স্থান।

স্ত্রীদেরকে ইবাদত ও নফল আদায়ের শিক্ষা দিতেন

أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ.

উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন এক রাতে নবীজিﷺ ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে বলতে লাগলেন, সুবহানআল্লাহ , আল্লাহ তা'আলা কতই না খাযানা অবতীর্ণ করেছেন আর কতই না ফিতনা অবতীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা সালাত আদায় করে। এ বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরও বললেনঃ দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে।

(সহিহ বুখারি:৭০৬৯)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফেতনার দ্বার ও পুন্যের ধারা উন্মুক্ত হওয়ার সম্পর্কে জানলেন। তখন তিনিﷺ তাঁর স্ত্রীদের কে জানিয়ে দিলেন এবং ইবাদতে মনোযোগী হতে বললেন। নবীর স্ত্রী হওয়ার ওপর নির্ভর করে যেন ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে না যায় সেই বিষয়ে সতর্ক করলেন।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়,পুরুষদের উচিত স্ত্রীদেরকে ইবাদত সম্পর্কে জানানো, রাতে ইবাদত করার জন্য উৎসাহ দেয়া এবং ঘুম থেকে উঠিয়ে একসাথে আল্লাহর ইবাদতে সামিল হওয়া।

আল্লাহর নিকট পছন্দের আমল সম্পর্কে স্ত্রীদের জানানো

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, ‘যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।’ এরপর তিনি বলেন, ‘তোমরা সাধ্যমতো আমল করবে।’ [সহিহ বুখারি: ৬৪৬৫]

ইবনুল জাওজি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘দুই কারণে নিয়মিত আমল পছন্দনীয় :

এক. কোনো আমল ছেড়ে দেওয়া সে আমল থেকে বিমুখ হওয়ার মতো।

দুই. কোনো আমল নিয়মিত করা মনিবের সেবায় প্রতিটি সময় লেগে থাকার মতো। এক লোক মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে দিনের একটি অংশ দাঁড়িয়ে থাকল। দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকল। এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিই উত্তম প্রথম ব্যক্তির তুলনায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাদৃশ্য নিয়মিত আমলকারীর সাথে।’(ফাতহুল বারি:১/১০৩)

আমাদের উচিত কোন আমল করা শুরু করলে তা নিয়মিত করা যদিও তা অল্প হয়। হাদিস থেকে বুঝা যায় নিয়মিত আমল রবের নিকট সবচেয়ে পছন্দের। একজন স্বামী

চাইলে তার স্ত্রীকে নিয়মিত আমল করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে পারে। আমল করতে সাহায্য করতে পারে। সাংসারিক কাজে স্ত্রী যখন ব্যস্ত তখন স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করে স্ত্রীকে আমল করার সুযোগ করে দিতে পারে। কিন্তু আজকাল স্বামীরা কোন ভ্রুক্ষেপ ই করে না স্ত্রী কি কি আমল করলো নিয়মিত সবকিছু করতে পারলো কিনা। স্বামী চাইলেই পারে স্ত্রীর কাজে সাহায্য করে স্ত্রীকে ইবাদত করার সুযোগ করে দিতে।

স্ত্রীদের ইখলাসের শিক্ষা দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদেরকে ইখলাসের বিষয় গুরুত্ব দিতেন। তিনি ﷺ সবসময় স্ত্রীদেরকে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার শিক্ষা দিতেন। তিনি শিক্ষা দিতেন প্রতিটি ভালো কাজ ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে হোক তা অল্প কিংবা বেশি। লোক দেখানো ইবাদত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরত থাকতে বলেছেন। নবীজি ﷺ স্ত্রীদেরকে নিয়মিত আমল করার উৎসাহ দিতেন। তবে সে আমল লোক দেখানো না হয় খাঁটি অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠতার সাথে যেন করা হয়। আল্লাহর কাছে ইবাদতের বাহ্যিক রূপের চেয়ে নিয়তের পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতার মূল্য সবচেয়ে বেশি।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো আমল করো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দেওয়া থেকে বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো—যেটি নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।"

[সহিহ বুখারি: ৫৮৬১]

একবার রোজায় উম্মুল মুমিনদের নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে তা নিচে দেয়া হলো:-

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসুল ﷺ যখন ইতিকাফের ইচ্ছে করতেন, ফজরের নামাজ পড়ে সে স্থানে আসতেন,যেখানে তিনি ইতিকাফের জন্য অবস্থান করবেন। একবার রমাজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছে করলেন

তিনি। আদেশ করলেন তাঁবু খাটাবার। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -ও ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। রাসুলﷺ অনুমতি দিলে তার জন্যও তাঁবু খাটানো হলো। ইতিকাফের কথা হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা-এর কানে এল। তিনিও তৈরি করলেন একটি তাঁবু। জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা শুনে তিনিও বসালেন আরেকটি তাঁবু। সকালবেলা তিনি দেখলেন, দুটোর জায়গায় চারটি তাঁবু। জানতে চাইলেন, "এগুলো কী?" উম্মুল মুমিনদের তাঁবু খাটানোর কথা জানানো হলো তাঁকে। শুনে তিনি বললেন, "তারা কি সওয়াবের আশায় এরূপ করেছে?"
অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এমনটা করার কারণ কী? নেক নিয়ত?" এরপর রাসুলﷺ তাঁবুগুলো তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। বললেন, "এগুলো তুলে ফেলো। এগুলো আমি দেখতে চাই না।"

রাসুলﷺ এর আদেশমতো তাবুগুলো তুলে দেওয়া হল। রমজানে আর ইতেকাফ করেননি শাওয়াল মাসের প্রথম ১০ দিন ইতেকাফ করে নেন।
(সহিহ বুখারী:২০৩৩)

ইবনে হাজার(রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসুলﷺ এর আশঙ্কা হয়েছিল ইতিকাফের জন্য স্ত্রীদের তাঁবু-খাটানো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়; বরং ঈর্ষা ও অহংকারের প্রতিযোগিতার বশবর্তী হয়ে এমনটা করেছে তাঁরা। তাঁদের এ কাজের পেছনে রাসুলﷺ এর নিকটে থাকার আশাই নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে তাদের ইতিকাফের উদ্দেশ্য-আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে অন্য কিছু হয়ে যাওয়ায় রাসুলﷺ তাঁবু তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।'(ফাতহুল বারি:৪/২৭৬)

রাসুল ﷺ আশঙ্কা করেছিলেন, স্ত্রীদের এই পারস্পরিক রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ফিতনা বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারে। তাই সমাজ ও পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁবুগুলো অপসারণের নির্দেশ দেন।

ইবনে হাজার আরও বলেন, এর মাধ্যমে রাসুল ﷺ উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো ইবাদতে পার্থিব মোহ, লোক দেখানো মনোভাব বা রেষারেষি প্রবেশ করলে সেই ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষা ও পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁবুগুলো তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিকাফের মতো নিঃসঙ্গ ইবাদতে জাগতিক প্রতিযোগিতা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকা ইসলামে অনভিপ্রেত।

ইতিকাফ হলো একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত ইবাদত। কিন্তু যখন এতে পার্থিব প্রতিযোগিতা ও মনোযোগ আকর্ষণের মনোভাব যুক্ত হলো, তখন ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

স্ত্রীদের উপকারী জিকির শেখাতেন

জুয়াইরিয়া রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'ফজরের সময় রাসুল ﷺ তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, তিনি বসে আছেন নামাজের জায়গায়। রাসুলﷺ বললেন, "তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তুমি এভাবেই বসে আছ?" জুয়াইরিয়া রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, "হ্যা।" এরপর রাসুলﷺ বললেন, "তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি আমার সে জিকির আজকের দিনে তোমার পঠিত জিকিরের সাথে ওজন দেওয়া হয়, তবে এ কালিমা চারটির জিকিরের সমান হবে। জিকিরটি হচ্ছে

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كلماته

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)।"(সহিহ মুসলিম:২৭২৬)

বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন

সাদাকা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জন করা যায়।দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক ফায়দা অর্জিত হয়।রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে বেশি বেশি সাদকাহ করার তাগাদা দিতেন।দান করার ফযিলত অনেক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কে বললেন যে, "আয়িশা, এক ফালি খেজুর সাদাকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করো।কেননা,এক ফালি খেজুরও ক্ষুধার্তের তৃপ্তির কারন হয়।"(মুসনাদু আহমাদ:২৩৯৮০)

হাদিস থেকে বুঝা যায়, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে দিলেন যার যতটুকু সামর্থ্য আছে হোক তা পরিমানে কম,তার ততটুকু দিয়ে হলেও যেন জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।সাদাকা করলে আল্লাহ মানুষকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন। অল্প সাদকাহ ও আমলের পাল্লা ভারী করতে পারে যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

অন্য আরেকটা হাদিসে আছে,
আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

- 'এক ফকির আমার কাছে এল। তখন আমার ঘরে রাসুল ﷺ ছিলেন। তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদিমাকে) আদেশ দিলাম আমি। এরপর সাদাকার বস্তুটা নিয়ে আসার জন্য বললাম। সেটার প্রতি তাকালাম। তখন রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি কি চাও না যে তোমার অগোচরে ঘরে কোনো কিছু প্রবেশ করুক বা বের হোক?" আমি বললাম, "হাঁ।" রাসুল ﷺ ও বললেন, "যেতে দাও, "আয়িশা", হিসেব কোরো না, তুমি হিসেব করলে আল্লাহও তোমায় হিসেব করে দেবেন।

  (সুনানু আবি দাউদ:১৭০০)

আল্লাহর পথে দান করার সময় গুনে গুনে দান করা অনুচিত। আল্লাহর ভান্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই,আল্লাহ চাইলে আমাদের করা সাদাকা করার পরিমান থেকেও বেশি আমাদের দান করতে পারেন। সাদাকা করার মাধ্যমে বরকত হয়। যা যায় তারচেয়ে

অনেক গুন ফিরে আসে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর বান্দাকে অফুরন্ত নেয়ামত ও রিজিক দিয়ে থাকেন। দান করার সময় কৃপনতা করা ঠিক না। হতে পারে কৃপনতা করে দান করার ফলে আল্লাহ ও আমাদের কে হিসেব করে বা সীমিত এর প্রতিদান দিতে পারেন।

ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হিসেব করে দেওয়ার অর্থ কোনো কিছুর নির্দিষ্ট ওজন বা সংখ্যা জানা। আর অনেকে সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাদাকা করে না। সাদাকা না করার এ মনোবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়েছে এ হাদিসে। এমন মনোবৃত্তি সম্পদ থেকে বরকত রহিত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা, আল্লাহ তাআলা দানের প্রতিদানে অনেক সাওয়াব দিয়ে থাকেন। তাই যে ব্যক্তি অগণিত পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন দানের সময় হিসেবি না হয়, কৃপণতা না করে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলা অগণিত রিজিক দিতে পারেন, তার ওপর কর্তব্য হচ্ছে, বিনা হিসেবে দান করা।'

(ফাতহুল বারি:৩/৩০০;ঈষৎ পরিমার্জিত)

সাদকাহ করার সময় কৃপনতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অনেকেই আছে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাদাকা করেন না। নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয় সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে দান করতে চান না,এরূপ মনমানসিকতা থেকে আল্লাহ সবাইকে বিরত থাকতে বলেছেন। যারা এমন করে তাদের সম্পদ থেকে আল্লাহ রহমত ও বরকত উঠিয়ে নেন।

'পরিবারের লোকেরা যখন ছাগল জবাই করতেন, তখন রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করতেন, "সাদাকা দেওয়ার পর কতটুকু আর বাকি আছে?" আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, "কাঁধের গোশতটুকু।" রাসুলﷺ বললেন, "তবে তো কাঁধের গোশত ছাড়া আর সবটাই অক্ষত আছে (সাদাকা দিয়ে)। "

(সুনানে তিরমিজি:২৩৯৪)

'অর্থাৎ তোমার কাছে কাঁধের যে গোশতটুকু আছে, সেটা অক্ষত নেই। বরং সাদাকা যা দিয়েছ, তা অক্ষত আছে। রাসুলﷺএর এ কথা এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে,
আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ "তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা টিকে থাকবে।"

(সুরা আন-নাহল, ১৬: ৯৬)

আমরা যা সাদকাহ করি তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় কমে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহর কাছে তার হিসেব আছে এবং আখিরাতে এর ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর বান্দাকে অফুরন্ত নেয়ামত দিবেন।
তাই যারা আল্লাহর রহমত বরকত ও অফুরন্ত নেয়ামত পেতে চায় তারা যেন সাদাকা করার সময় হিসেব করে না দেয় কৃপনতা যেন না করে।

সচ্চরিত হওয়া শেখাতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,
'পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি বললাম, "যতক্ষণ আমাকে নবীজি ﷺ অনুমতি না দেন-আমি অনুমতি দেবো না।" কেননা, আফলাহর ভাই আবুল কুআইস আমাকে দুধ পান করায়নি। আমাকে দুধ পান করিয়েছিল আবুল কুআইসের স্ত্রী। নবীজি ﷺ আমার কাছে আসলে তাঁকে বললাম, "আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আপনার কাছ থেকে না জেনে আমি অনুমতি দিইনি।" নবীজি ﷺ বললেন, "তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে বাধা কোথায়?" আমি বললাম, "আবুল কুআইস তো আমাকে দুধ পান করায়নি।
আমাকে দুধ পান করিয়েছিল তার স্ত্রী।" রাসুলﷺ এবার বললেন, "তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দেবে, কারণ সে তোমার চাচা।"

(সহিহ বুখারী-৪৭৯৬)

মন্দের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে স্ত্রীদের শেখাতেন

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
“এক রাতে আল্লাহর রাসূলﷺ আমার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন “আয়িশা” এটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কারণ এর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَ

“অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।"
(সুরা ফালাক:আয়াত-০৩)

ইবনে কাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন তিনি রাতের অন্ধকার থেকে আশ্রয় চাইতে বলার কারণ হলো মন্দ সাধারণত রাতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য আরেক হাদীসেও সরাসরি চাঁদের কথা বলা আছে যা এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ রাত চেনা যায় চাঁদের ধারা এবং এটা কেবল রাতেই দেখা যায়।
স্ত্রীকে শেখানোর ব্যাপারে তিনিﷺ এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে হাত ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনিﷺ শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি একই সাথে কারণও ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

ফারওয়া ইবনে নাওফাল আশজা’ঈ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর কাছে কি কি দুআ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সে সব কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই যা আমি আমল করেছি এবং আমি যা করিনি তা থেকে”।
(সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬৪৭ (আন্তর্জাতিক নং ২৭১৬-১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদেরকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য রাতে সুরা ফালাক নাস পড়ে শরীরে ফু দিয়ে ঘুমাতে নির্দেশ দিতেন।

রাসুল ﷺ তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদতগুলো শেখাতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

"আমি কাবার ভেতরে প্রবেশ করে সালাত পড়তে পছন্দ করতাম। একবার নবীজিﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরের (কাবার অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল) ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কাবার ভেতর সালাত পড়তে চাইলে হিজরের ভেতর সালাত পড়ো-এটি কাবারই অংশ।"(আবু দাউদ:৮০২)

এভাবে তিনি তাকে কাবার ভেতরে সালাত পড়ার একটি সহজ উপায় শিখিয়ে দিলেন।

তাকওয়া অর্জন ও ভালো ব্যবহার করতে বলতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

“একবার নবীজিﷺ তাঁকে বললেন, "আয়িশা”, সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকো এবং দয়ার আচরণ করো। কারণ, দয়া যখন কোনো কিছুতে যুক্ত হয়, তখন তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে; আর কোনো কিছুতে দয়া না থাকলে তা বিকৃত (ও ত্রুটিপূর্ণ) হয়ে যায়।”(আহমদ:২৩৭৮৬)

সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

নবীজিﷺ তাঁকে বলেছেন, "আয়িশা”, সব সময় মানুষকে দয়া করো। আল্লাহ যখন কোনো ঘরের মঙ্গল চান, তিনি তার মাঝে দয়া-প্রসার করে দেন।"

(আহমাদ(২৩৯০৬)

স্ত্রীদের নম্রতার সঙ্গে কথা বলা শিখিয়েছেন

নবীজি ﷺ তাঁর পরিবারকে নম্রতার কথা বলতেন। নবীজি ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কে বলেন, “হে আয়িশা”, নম্রতা অবলম্বন করো।কেননা,আল্লাহ তাআলা যখন কোন পরিবারের জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন,তাদেরকে নম্রতার পথ দেখিয়ে দেন।”

(মুসনাদে আহমাদ:২৩৯০৬)

“একবার ইহুদিরা এসে সালামকে বিকৃত করে নবীজি ﷺ - কে বলে-'আসসামু আলাইকুম'। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক।

নবীজি ﷺ বলেন-'ওয়াআলাইকুম।' তোমাদেরও।

নবীজি ﷺ -এর শানে এমন বেয়াদবি দেখে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক, তোমাদের ওপর লানত ও গজব নাজিল হোক।'

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-'আয়িশা থামো! তুমি নম্রতা অবলম্বন করো এবং রূঢ়তা ও অশালীনতা বর্জন করো।'

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন-'আপনি শোনেননি তারা কী বলেছে?'

নবীজি ﷺ বললেন-'তুমি শোনোনি আমি কী বলেছি? তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে তাদের দুআ কবুল হবে না। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমার দুআ কবুল হবে।

(সহিহ বুখারী:২৯৩৫)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা উদার ছিলেন এই হাদিস এর মাধ্যমে ও বুঝা যায়। তাঁকে কেউ খারাপ কথা বললে কখনো তিনি রাগ দেখিয়ে কারো সাথে খারাপ কথা বলেন নি বরং কেউ বলতে নিলে তিনিﷺ বাঁধা দিতেন যেমনটা আয়িশা

রাদিআল্লাহু আনহা কে দিয়েছেন,সাথে বুঝিয়েও দিয়েছেন সবার সাথে নম্রভাবে কথা বলতে হবে।

আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে নম্রতা বলতে কিছুই নেই।যে যেভাবে পারছে রাগ দেখিয়ে মানুষ কে কষ্ট দিয়ে কথা বলছে।সবাই দাপুটে।সবাই গরম।অথচ তারাই বলে আমাদের ঘরে শান্তি নেই, কল্যান নেই!

স্ত্রীদের মধ্যে মন্দ কিছু দেখলে তা শুধরিয়ে দিতেন।

“একবার আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এক লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলেন। ঘরোয়া মজলিশে অনেকেই এ ধরনের কাজ করেন। নবীজি ﷺ তখন বললেন, আমাকে যদি বিনিময়ে এত এত সম্পদ দেওয়া হয়, তবুও পরিহাস করে কারও ভঙ্গি আমি নকল করতে রাজি নই।” (সুনানে তিরমিজি :২৫০২)

অন্য আরেকটা হাদিসে বর্ণিত আছে,
আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,
“আমি একদিন নবীজি ﷺ -এর কাছে সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা -এর শারীরিক উচ্চতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বললাম, "আপনার জন্য সাফিয়ার এতটুকুই (খাটো হওয়া) যথেষ্ট।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা যদি সাগরের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সাগরের পানিকে পর্যন্ত দূষিত ও তিক্ত করে ফেলবে।"

[সুনান আবূ দাউদ: ৪৮৭৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআন এ বলেছেন,

يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَا بَزُوْا بِا لْاَ لْقَا بِ ۗ بِئْسَ الِا سْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِ يْمَا نِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُ ولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হতে) যারা তাওবাহ না করে তারাই যালিম।" (সুরা হুজরাত আয়াত নং:১১)

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন মুমিনরা যেনো কাউকে কটাক্ষ করে কথা না বলে।কাউকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে। হতে পারে আমরা যাদের নিয়ে রসিকতা করছি তারা হয়তো আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দের বান্দা। আখিরাতে তারা আমাদের চেয়ে বেশি এগিয়ে থাকতে পারে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে দেখে আমরা মানুষকে যা ভাবি তেমন না ও হতে পারে মৃত্যুর আগে তওবা করে মানুষ টা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যেতে পারেন।

এমনি ছোট ছোট ভুল আমাদের গুনাহের ওজন অনেক বেশি করে ফেলে।
রাসুলুল্লাহ ﷺ তিনি স্ত্রীদেরকে একদম নিখুঁত ভাবে সবকিছু বলে দিতেন বুঝিয়ে দিতেন ভুলগুলো সুন্দর করে শুধরিয়ে দিতেন।

কিন্তু এখন এমন হয়েছে স্ত্রী একটু ভুল করলেই মা বাবা নিয়ে বিশ্রীভাবে বকা-ঝকা করে।ভালো করে একটু বুঝিয়ে না বলে রাগ দেখিয়ে ধমক দিয়ে কথা বলে। মজলিস রাস্তা ঘাট যেখানে ইচ্ছে সেখানে স্ত্রীকে অপমান করা হয়।

রমজানের শেষ দশ দিন ইবাদত এর জন্য জাগিয়ে দিতেন

নবীজিﷺ শুধু নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন না, বরং তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদেরকেও ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন, যাতে তারাও এই বরকতময় রাতগুলোর ফজিলত লাভ করতে পারে। কোমড় বেঁধে ইবাদত করতে লেগে পরতেন। শেষ দশ দিন নবীজি ﷺ প্রচুর ইবাদত করতেন।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'রমাজানের শেষ দশক এলে বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন রাসুল ﷺ । রাত জেগে নিজে ইবাদত করতেন। স্ত্রীদেরও জাগিয়ে দিতেন।' (সহিহ বুখারী:২০২৪)

আলি রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'রমাজান মাসের শেষ দশকে রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের জাগিয়ে তুলতেন ইবাদত করার জন্য।'(সুনানুত তিরমিজি:৭২৫)

রমাদান একটি পবিত্র মাস। এই মাস কে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর তার মধ্যে শেষ দশকে অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। শেষ দশকের মধ্যে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে ইবাদতের সওয়াব হাজার মাসের চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

নবীজি ﷺ নিজে ইবাদত করতেন সাথে সাহাবি পরিবারের সবাইকেও উৎসাহ দিতেন।

অন্যান্য ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন

সারা বছর স্ত্রীদের বিতরের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার কথা বর্ণনা করে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের একটা সময়ব্যাপী নামাজ পড়তেন। যখন তিনি বিতর আদায় করতেন, তখন বলতেন, "ওঠো। বিতর আদায় করো, আয়িশা।" (সহিহ বুখারী:৫১২)

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সারা বছর বিশেষ করে বিতরের জন্য জাগিয়ে তুলতেন। কারণ, বিতর ধারাবাহিক ও অবশ্যপালনীয় বিধানগুলোর একটি।

ইবাদতে অতিরিক্ত কাঠিন্য ও রেষারেষি পছন্দ করতেন না

ইবাদতে অতিরঞ্জন বা নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট করা ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম সর্বদা ভারসাম্য ও ধারাবাহিকতা পছন্দ করে।

নবীজি ﷺ বলেছেন, "তোমরা কেবল সেই পরিমাণ আমলই করো, যতটুকু করার সামর্থ্য তোমাদের আছে। কেননা, আল্লাহর কসম! আল্লাহতায়ালা (সওয়াব প্রদানে) ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো।"

ইবাদতে অতিরিক্ত কাঠিন্য ও রেষারেষি পছন্দ করতেন না। একবার এক মহিলা সম্পর্কে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এই মহিলা রাতে ঘুমায় না। অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করে। তখন নবীজিﷺ আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে রাতে ঘুমায় না! তোমরা আমল (নফল) এই পরিমাণ করবে,যতটুকু তোমাদের সাধ্য আছে, আল্লাহর কসম! তিনি ততক্ষণ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেই বিরক্ত হয়ে পড়ো। (সহিহ মুসলিম, ইফা,১৭০৩)

অতিরিক্ত ইবাদত এর মাধ্যমে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে,এতে ইবাদত করে প্রশান্তি পাওয়া যায় না।

ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আদেশ দিতেন

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'একদিনের কথা, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে দেখলেন মসজিদে দুটি সারির মাঝে রশি বাঁধা। তিনিﷺ বললেন, "এ রশি কেন?" সাহাবিরা বললেন, "এটি জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা এর

রশি। তিনি নামাজ পড়তে থাকেন। যখন অলসতা আসে বা শরীর অবসন্ন হয়, তখন এর সাহায্য নেন।" রাসুলﷺ বললেন, "এ রশি খুলে ফেলো। তোমরা যতক্ষণ শরীরে উদ্যম অনুভব করবে, ততক্ষণ নামাজ পড়বে। যখন শরীর ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন বসে পড়বে।"(সহিহ বুখারী:১১৫০)

ইমাম নববি বলেন, 'এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ইবাদতে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। ইবাদত করতে হবে উদ্যম ও প্রাণবন্ততার সাথে। কিন্তু ইবাদত করতে করতে যখন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন আরাম করতে হবে যতক্ষণ না অবসন্নতা কেটে যায়। '

বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা দিতেন

নারীদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিশেষ সময় নির্ধারণ করতেন নবীজি ﷺ - পুরুষদের যেভাবে দীনের তালিম বা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে নারীদের আকিদা ও মাসআলা শেখানোর জন্য আলাদা সময় ও মজলিস নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেখানে নারীরা তাঁদের ঈমান ও আকিদা সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন করে সমাধান নিতেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা সহ অন্যান্য স্ত্রীরা আকিদা, ফিকহ ও ইসলামের গভীর জ্ঞানের বড় কেন্দ্র ছিলেন, এমনকি অনেক পুরুষ সাহাবিও তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'একবার রাসুলﷺ অসুস্থ হলে জনৈক স্ত্রী হাবশার একটি গির্জার কথা তুলল তাঁর সামনে। এ গির্জাকে মারিয়া বলা হতো। উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা ও উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা দুজনই হাবশায় গিয়েছিল। তারা এ গির্জার সৌন্দর্য ও গির্জায় থাকা ছবিগুলোর ব্যাপারে বলল। রাসুলﷺ তখন মাথা তুলে বললেন, "তাদের কোনো নেক লোক মৃত্যুবরণ করলে এসব লোক নেক লোকগুলোর কবরে সিজদা করে। এরপর তাদের ছবি বানিয়ে নেয়। আল্লাহর নিকট এরা সবচেয়ে মন্দ সৃষ্টি।"

(সহিহ মুসলিম:৫২৮)

নবীজি ﷺ শয্যাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আকিদা সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করেছেন।
নবীজি ﷺ অসুস্থ অবস্থায়ও একটি মারাত্মক ভুল সংশোধন করার জন্য বিরত থাকেননি।

স্ত্রীদের মধ্যে যে দান করবে বেশি সে জান্নাতে নবীজির ﷺ সাথে সবার আগে মিলিত হবে

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহﷺ বলেন, "তোমাদের মাঝে সবার আগে আমার সাথে (জান্নাতে) তার দেখা হবে, যার লম্বা হাত রয়েছে (অর্থাৎ যিনি অনেক বেশি দান করেন)।" আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাপতে গিয়ে দেখলাম, সব থেকে লম্বা হাত সাওদার; কিন্তু (হাদীসের মতে) লম্বা হাত ছিল জাইনাবের; কারণ, সে নিজ হাতে জিনিস তৈরি করত (ও বিক্রি করত) এবং সে-অর্থ দান করত।" (সহিহ বুখারী :১৪২০)

নববী রাহ. বলেন, "শুরুতে তারা ভেবছিলেন যে, নবীজিﷺ আক্ষরিক অর্থে হাতের দৈর্ঘ্যের কথা বলেছেন; তাই তারা হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে দেখলেন, সাওদার হাত দৈর্ঘ্যে লম্বা। অন্যদিকে জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উদার দানশীল; এবং তিনি মারা গেলে (তিনি নবীজিরﷺ পর প্রথম মারা যান) তারা বুঝতে পারলেন, এটি একটি রূপক ছিল। এর দ্বারা নবীজিﷺ দান করার কথা বুঝিয়েছেন।”

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, "এই রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের উচিত যত সম্ভব বেশি বেশি দান করা; তা হলে আমরা নবীজিরﷺ সাথে জান্নাতে দেখা করতে পারব।" (ফাতহুল বারি:৩/২৮৬)

জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা নিজের হাতে কাপড় সেলাই করে যা উপার্জন করতেন তা দান করে দিতেন।

এর থেকে বুঝা যায় সাদাকা করতে হবে সৎ উপার্জন টাকা দিয়ে এবং একনিষ্ঠতার সাথে।
যে যতবেশি সাদাকা করবে সে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে।

না জেনে কোন বিষয়ে ফতোয়া বা বিধান দিতে নিষেধ করেছেন

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
“একদিন রাসুল ﷺ -কে এক আনসারি শিশুর জানাজায় ডাকা হলো।আমি রাসুল ﷺ -এর উদ্দেশ্য বললাম, “ আল্লাহর রাসুল, তার কোন গুনাহ নাই। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত সে। তাই জান্নাতের এ চড়ুইয়ের জন্য সুসংবাদ।” আমার কথা শুনে রাসুলﷺ বললেন, “অন্যটাও হতে পারে, “আয়িশা”, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য। তাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে। আবার জাহান্নামবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য। তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে থাকে,তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের গন্তব্য।”

[সহিহ মুসলিম :২৬৬২]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন- যা জানা নেই তা নিয়ে যেন কথা না বলে। কোন বিষয় তাড়াহুড়ো করে ফতোয়া যেন না দেয়।

আজকাল আমাদের সমাজে এমন মানুষরাও ফতোয়া দেয় যারা কিতাব কখনো হাতে নেয় নাই। যখন যাকে ইচ্ছে কাফের কিংবা জাহান্নামে যাবে এমন বলে ফতোয়া দিচ্ছে।অথচ তার ব্যপারে জানেও না সঠিকভাবে।

হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহর রাসুল ﷺ না জেনে ফতোয়া দিতে নিষেধ করেছেন। গায়েবি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জানেন,এবং আখিরাতে কার আমল নামায় কি আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন।

ছোট ছোট পাপের ব্যাপারে স্ত্রীদের সাবধান করতেন

يا عائشةُ إيَّاكِ ومُحقَّراتِ الأعمالِ فإنَّ لها مِن اللهِ طالبًا

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,
রাসুলুল্লাহﷺ বলেন, "আয়িশা, সগীরা গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থাকো। আল্লাহ সেগুলো লিখে রাখার জন্যও একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন।"(ইবনে মাজাহ:৪২৪৩)

আস-সিন্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সগীরা গুনাহ এমন পাপ, যেগুলো মানুষ অনেক তুচ্ছ ভাবে এবং সহজেই করে বসে। আল্লাহর নিকট সে-সব গুনাহ অনেক বড়, তাই সেগুলো লিখে রাখার জন্যও একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। ছোট ছোট গুনাহ থেকে একসময় বড় আকার ধারন করে কবিরা গুনাহ হয়ে যায়। সব কিছু লিখে রাখার জন্য আল্লাহ ফেরেশতা নিযুক্ত রাখেন এমনকি ছোট ছোট কাজ ও লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত আছে।

মাসআলা দুর্বোধ্য মনে হলে স্ত্রীগন বারবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন

ইবনে আবি মুলাইকা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসুল ﷺ -এর কোনো কথা না বুঝলে বারবার জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন। একবার নবীজি ﷺ বললেন, "যে হিসাবের সম্মুখীন হলো, তাকে শাস্তি পেতে হবেই হবে।" আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا - "হিসাব সহজভাবেই নেওয়া হবে।
(সুরা আল-ইনশিকাক, ৮৭: ৮)

" উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন, "এটা তো কেবল প্রকাশ করা। কিন্তু পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যার হিসেব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে। " (সহিহ বুখারী:১০৩)

ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা আদায় করার উপদেশ দিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিতেন। যখন বিপদ আসবে ধৈর্য্য ধারন করে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে বলতেন। তিনি উপদেশ দিতেন, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে শুকরিয়া আদায় করার। মুমিনের সব অবস্থায় ই কল্যানকর।

নবীজি ﷺ সর্বদা ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন। এক শোকার্ত মহিলার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আঘাত বা বিপদের শুরুতে ধৈর্য ধারণ করাটাই হলো প্রকৃত ধৈর্য।" (সহিহ মুসলিম- ৯২৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের অল্পে তুষ্ট থাকা এবং স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দিতেন।
আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সেই নারীর দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকান না,যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, অথচ সে তার স্বামীর মুখাপেক্ষীহীন থাকতে পারে না।"

(সুনান আন-নাসায়ী- ৯১৩৫; সহিহ ইবনে হিব্বান)

অনেক নারীরা স্বামীদের কাছে এমন এমন আবদার করে যা দিতে স্বামীরা হিমশিম খায়। স্বামী কিছু দিলে তাতে সন্তুষ্ট হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না স্বামীর প্রতি। এসব নারীদের উপর আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে। সুখ-শান্তি এলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণময় হয়। আর দুঃখ-কষ্ট পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"

(সহিহ মুসলিম - ২৯৯৯)

নবীজির ﷺ সাংসারিক সমস্যা ও তার সমাধান

প্রতিটি সংসারেই কোন না কোন সমস্যা হয়। কোন সংসারই সমস্যা থেকে পূর্ণ মুক্ত থাকেনা। কিন্তু কীভাবে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে হবে তা রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। নববী পরিবারেও কিছু পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে যেন অন্যরা শিখতে পারেন, জানতে পারেন এ বিষয়গুলোতে রাসুলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন। রাসুল ﷺ একজন আদর্শ স্বামী। সকলের জন্য তিনি আদর্শ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এক অনুপম শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আল্লাহ কুরআন এ বলেছেন,

' وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।

(সুরা নিসা:১৯)

প্রতিটি সংসারে কিছু না কিছু সমস্যা থাকেই। এটা তেমন গুরুতর বিষয় নয়। তবে গুরুতর হবে তখন, যখন ইনসাফের মাধ্যমে সমাধান করা না হয়। ইনসাফ করতে না পারলে সমস্যা বিপদজনক হয়ে যেতে পারে,যার ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল দেখা যায়। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিশেষে তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

নবি পরিবারেও কিছু কঠিন সমস্যার সময় অতিবাহিত হয়েছিলো। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এর মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন, জানিয়েছেন।

স্ত্রীদের ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা

মদিনায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং রাসুল ﷺ এর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনের কারণে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ (উম্মুল মুমিনীন) দৈনন্দিন সাংসারিক খরচে কিছুটা সংকটে পড়েছিলেন।
রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর ঘরে অনেক সময় মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলত না, শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে দিন পার করতেন। পরবর্তীতে যখন খায়বার বিজয়সহ মদিনায় সম্পদের আগমন ঘটে, তখন স্ত্রীদের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই পার্থিব জীবনের আকাঙ্ক্ষা বা পরিবারের জন্য একটু স্বচ্ছলতার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

খায়বার বিজয়ের পর পবিত্র স্ত্রীগনের জন্য যে খোরপোশ নির্ধারিত হয়েছিল, তা একে তো খুবই কম, তার উপর তাদের বদান্যতা,দানশীলতা -সব মিলিয়ে টানাটানি করেও বছর পার হওয়া ছিলো কঠিন। ঘরে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। অথচ পবিত্র স্ত্রীগণের অনেকেই ছিলেন ধনী পরিবারের মেয়ে বরং শাহজাদি। তারা ইতিপূর্বে কেউ নিজের ঘরে, কেউ স্বামীসংসারে, অঢেল সম্পদ ও ভোগবিলাসের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করেছেন। তাই মদীনা যখন ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, আর অজস্র ঐশ্বর্য যখন রাসুলের পদতলে, তখন নবীপরিবারের বার্ষিক খরচ কি একটু বাড়ানো যায় না? পবিত্র স্ত্রীগণ এই মর্মে তাঁদের মনোবাঞ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু এ ঘটনা বর্ণনা করেন,
'আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এলেন রাসুল ﷺ -এর কাছে। দেখলেন, অনেক মানুষ তাঁর দরোজায় বসে আছে। কিন্তু কাউকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এগিয়ে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন ভেতরে। এরপর এলেন উমর রাদিআল্লাহু আনহু। অনুমতি চাইলেন প্রবেশের। তাকেও অনুমতি দেওয়া হলো। উমর রাদিআল্লাহু আনহু দেখলেন, রাসুল ﷺ -এর পাশে তাঁর স্ত্রীরা। রাসুল ﷺ নীরব। তাঁর চেহারায় চিন্তার ছাপ। আবু

বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "আমি এমন কিছু বলব, যাতে রাসুল ﷺ হেসে দেন।"

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ আমার কাছে খোরপোশ চাইলে বিনতে খারিজার (তার স্ত্রী) সাথে কেমন আচরণ করি, আপনি যদি দেখতেন! এ অবস্থায় আমি তার কাছে যাই এবং তার ঘাড়ে আঘাত করি।"

রাসুল ﷺ হেসে দিলেন। বললেন, "আমার পাশে যারা বসে আছে, তারাও আমার কাছে খোরপোশ চাচ্ছে।"

রাসুল ﷺ -এর কথা শুনে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু উঠে গেলেন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। ওদিকে উমর রাদিআল্লাহু আনহু এ-ও এগিয়ে গেলেন হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা এর দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। উভয়ে বলে উঠলেন, "তোমরা এমন কিছু রাসুল ﷺ -এর কাছে চাইছ, যা তাঁর কাছে নেই।"

রাসুল ﷺ তাঁদের দুজনকে নিবৃত্ত করলেন।
তখন রাসুল ﷺ -এর স্ত্রী দুজন বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমরা এমন কিছু রাসুল ﷺ -এর কাছে চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।"

(এরপর এক মাস কেটে গেলো। রাসুল ﷺ স্ত্রীদের থেকে পৃথক রইলেন।)
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আয়াত নাজিল করলেন:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَا جِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَا لَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُ سَرِّحْكُنَّ سَرَا حًا جَمِيْلًا

"হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও- তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই।"

وَاِ نْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَا لدَّا رَ الْاٰ خِرَةَ فَاِ نَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

"আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পরকালের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"
(সুরা আহজাব - আয়াত: ২৮,২৯)

তিনিﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে) শুরু করলেন। তিনিﷺ বললেন, "আয়িশা, আমি তোমার সাথে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে-বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি।"

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, “কোন বিষয় হে আল্লাহর রাসুল।” রাসুল ﷺ আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোনো প্রয়োজন নেই) বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি, সে-সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের কারও কাছে ব্যক্ত করবেন না।' তিনি বললেন, "তাদের যে-কেউ সে-বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে বলে দেব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।" এরপর বাকি স্ত্রীদেরও একই ব্যাপার বলা হলো এবং তারাও আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর মতো একই উত্তর দিলেন।' (সহিহ মুসলিম:১৪৭৮)

এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছু ই শিখতে পারি।

- প্রথমত রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের দাবি শুনে চুপ ছিলেন। তাদের কে কটাক্ষ করে কোন কথা বলেন নি,ধমকও দেননি।
- এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ বিষয় গুলো উপেক্ষা করলেন। সংসারে অনেক সমস্যা ই হয়। সব সমস্যার সমাধান করার উপায় এক রকম থাকেনা। কিংবা সহজে

তা সমাধান ও করা যায় না। তাই বলে সমস্যা হলেই ঝগড়াঝাঁটি করতে হবে এমন টাও নয়। এমন সময় তর্ক করলে ঝগড়া করলে সমস্যা অন্য দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- আয়াত নাজিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল ﷺ স্ত্রীদেরকে সে বিষয় বললেন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে না বললেন। মা বাবাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন।
- স্ত্রীদেরকে দু'টি অপশন দিয়েছেন যার যে বিবেক আছে তা দিয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। দাম্পত্য জীবনে যে সমস্যা হয় তাতে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেয়ার বিষয় এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা ও দিতে হয়। কারো চাপে কিংবা জোর করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবেনা।
- রাসুলুল্লাহ ﷺ এই বিষয় গুলাতে কঠোরতার অবলম্বন করে নাই। তাদের গায়ে হাত তুলেন নাই। অপমানও করেননি। বরং এক সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেছেন। যখন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁরা তাদের মেয়েদের কে আঘাত করতে গেলেন তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বাঁধা দিলেন। কারণ মারধর করে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং অনেক সময় আলাপ আলোচনা করে কিংবা স্ত্রী নয়ত স্বামীকে চুপ থেকে সবটা পর্যবেক্ষণ করে সমাধান করতে হয়।

নারীদেরও উচিত স্বামীর ইনকাম দেখে স্বামীর কাছে আবদার করা। একজন মেয়ে বাপের বাড়ি যতই আদরে বড় হোক না কেন স্বামীর বাড়িতে এসে তা আর হয় না অনেক মেয়েদের। বাপের বাড়িতে মেয়েকে আদর করে বড় করার পর স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মেয়ের ভরনপোষণের দায়িত্ব তখন মেয়ের স্বামীর উপর পরে। প্রতিটি মেয়েকেই বুঝতে হবে এই বিষয়ে। স্বামীকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু বলে তারজন্য চাপ না দেয়া।

এদিকে স্বামীকেও বুঝতে হবে এবং হালাল ভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা। কোন হারাম পথে না যাওয়া। স্ত্রীকে অবহেলা না করা। স্ত্রীকে আগলে রাখা। স্ত্রীকে শান্ত ভাবে সুন্দর করে বুঝানো। স্বামীর সাধ্যনুযায়ী স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছে পূরণ করা। এতে করে সংসার হয়ে উঠবে সুখময়। যতই অভাব অনটন থাকুক না কেন স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক মধুর হলে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধ আসবেই ইংশাআল্লাহ।

তাহরীমের ঘটনা

রাসুলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাজের পর পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে যেতেন এবং সবার সাথে অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করে আসতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। এমনটা হওয়ার সত্ত্বেও একবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, সব স্ত্রীগনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তবে কয়েকদিন জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা এর ঘরে একটু বেশি সময় কাটাতেন। অন্যান্য স্ত্রীগন নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করতেন। পরবর্তীতে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা কে তাঁর কোন কাছের মানুষ কিছু মধু হাদিয়া দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন,তাই জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা তাঁরﷺ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।
রাসুলুল্লাহ ﷺ সেই মধু ফিরিয়ে দিতে পারেন না তাই জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা এর ঘরে কিছু টা সময় বেশি থাকা হয়।

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বিষয়টি হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা ও সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা এর কাছে জানালেন এবং এই ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ খুবই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। দুর্গন্ধ পছন্দ করতেন না। সবসময় মেসওয়াক করতেন। নিজেকে পরিপাটি রাখতেন।
মৌমাছি যেই ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে সেই মধুতে ওই ফুলের স্বাদ এবং গন্ধ থাকে। আরবে মাগাফির নামক এক প্রকার ফুল ছিলো। সেই ফুলের গন্ধে নাবিযের মতো সামান্য ঝাঁঝ হতো।

এরপর আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এ-ব্যাপারে সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা সঙ্গে আলোচনা করলো। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, 'যখন তিনিﷺ তোমার ঘরে আসবেন, তখন তিনি অবশ্যই তোমার নিকটে যাবেন। এ-সময় তুমি তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি অবশ্য 'না'-ই বলবেন।' তখন তুমি বলবে, 'তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?' আর রাসুলুল্লাহরﷺ নিজের থেকে দুর্গন্ধ পাওয়াটা

খুবই গুরুতর মনে করতেন। তখন তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তা হলে ঐ মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস সংগ্রহ করেছে। আর আমিও একই কথা বলব। সাফিয়া, তুমিও তাঁকে এ-কথা বলবে।'

সাওদা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, 'কসম ঐ সত্তার, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। যখনই তিনিﷺ দরজার কাছে এলেন, তখনই আমি তোমার ভয়ে তোমার শেখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম।' এরপর তিনি যখন কাছে আসলেন, তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি 'মাগফীর' খেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?' তিনি বললেন, 'জাইনাব আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে।' আমি বললাম, 'তা হলে এ মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস সংগ্রহ করেছে।'

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আমার ঘরে এলেন, তখন আমিও তাঁকে তেমনি কথা বললাম। এরপর তিনি সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর ঘরে গেলেন, তিনিও তাঁকে তেমনি কথা বললেন।
রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন মধু খাবেন না বলে কসম করেছিলেন এবং স্ত্রীদের বললেন বিষয়টা যেন জানাজানি না হয়।
কিন্তু পরবর্তী তে বিষয় টা সব স্ত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে পরে। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা তাহরীম নাযিল করেন।

يٰٓاَ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَـكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَا تَ اَزْوَا جِكَ ۗ وَا للّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও, (আল্লাহ তোমার এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।"

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَـكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَا نِكُمْ ۗ وَا للّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী।"

وَاِ ذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَا جِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَ ظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَ عْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَا لَتْ مَنْ اَنْۢبَاَ كَ هٰذَا ۭ قَا لَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

"স্মরণ কর- যখন নবী তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তার স্ত্রীকে জানাল তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?'' নবী বলল, ''আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।''

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِ نْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِ نَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَا لِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَا لْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ

"তোমরা দু'জন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহর দিকে ফিরে আস (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে, তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা কর, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেককার মু'মিনগণ আর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।"

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَا جًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَا رًا

"নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সম্ভবতঃ তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমপর্ণকারিণী মু'মিনা অনুগতা, তাওবাহকারিণী, 'ইবাদাতকারিণী, রোযা পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।"

(সুরা তাহরীম-আয়াত: ১-৫)

ইফকের ঘটনা.

পূর্বে আলোচিত হয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে বের হতেন, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারিতে যার নাম উঠতো তিনি সফর সঙ্গিনী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতেন। এরকমই বনু মুস্তালিকের সফরে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। যাত্রাকালে প্রিয় ভগ্নি আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর একটি হার কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হারটি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর গলায় ছিল। হাড়ের আংটা এত দুর্বল ছিল যে বারবার খুলে যাচ্ছিল। সময়টা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের। সফরে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ হাওদায় আরোহন করতেন; এরপর হাওদার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ হাওদা উটের পিঠে অধিষ্ঠিত করতেন এবং কাফেলা চলতে থাকতো। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হালকা পাতলা ছিলেন এর জন্য হাউদা বাহক সাহাবীগণ সাধারণত বুঝতে পারতেন না ভেতরে কেউ আছে কিনা।

যুদ্ধ শেষ হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ করে অবসর হলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হল। মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গায় সফর বিরোধী হল। রাতের শেষ ভাগে আবার কাফেলা চলতে আরম্ভ করবে করবে- এমন সময় আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রকৃতি ডাকে সাড়া দিতে দূরে চলে গেলেন। প্রয়োজন সারার পর যখন উঠলেন তখন হঠাৎ গলায় হাত পড়ল। দেখলেন প্রিয় ভগ্নির কাছ থেকে কর্জ নেওয়া হারটি নেই। তিনি চমকে গেলেন। প্রথমত বয়স কম দ্বিতীয়ত কর্জ জিনিস। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতভম্ব হয়ে হার খুঁজতে লাগলেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল না বললেই চলে। তিনি ভেবেছিলেন, যাত্রা আরম্ভের পূর্বে হারটি খুঁজে পাবেন এবং সময়মত হাওদায় পৌঁছে যাবেন। তাই কাউকে কিছু বলার প্রয়োজনও মনে করলেন না।

এমন সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ যাত্রার আদেশ দেন। সাহাবীগণ হাওদা উঠিয়ে নিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হালকা পাতলা হওয়ায় চারজন মিলে হাওদা উঠানোর কারণে তারা বুঝতে পারে নি যে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভেতরে আছেন কিনা। তারা উট হাঁকিয়ে সফর চালিয়ে গেলেন। এদিকে সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর তিনি হারটি খুঁজে পেয়ে বিরতি জায়গায় ফিরে এলেন। কিন্তু সেখানে কাউকে পেল না। আয়িশা

রাদিয়াল্লাহু আনহা বাধ্য হয়ে সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন। ভাবলেন, যখন কাফেলা বুঝতে পারবে তখন নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসবে।

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাদিআল্লাহু আনহু সৈন্য দলের পেছনে পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন। কাফেলা চলাকালে বা যাত্রা বিরতির স্থানে যদি কাফেলার ছোটখাটো কোন জিনিস পড়ে যায় বা ভুল করে ফেলে যায় তাহলে সেগুলো দেখে শুনে নেওয়া এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁর। এজন্য তিনি অনেক পেছনে ছিলেন। কাফেলার পেছনে থেকে যাত্রাপথে সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি দিয়ে খোঁজ করছিলেন আর আসছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন একটি ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি। তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে আসলেন। তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে চিনতে পেরে "ইন্নালিল্লাহ" বলে উঠলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সজাগ ও সতর্ক হলেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে। মুখের ওপর কাপড় টেনে দিলেন। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর সাথে কোন শব্দ কথাও বলেননি। ইন্নালিল্লাহ পড়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন শব্দ তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়নি। তিনি উটকে বসালেন এবং অন্য মুখ হয়ে দূরে সরে গেলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উটে সওয়ার হলেন। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে উটে রশি ধরে মদিনার পথে চলতে লাগলেন। দুপুরবেলা যাত্রাবিরতি হওয়ায় সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিয়ে কাফেলে পৌঁছে গেলেন। তখন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু উটের রশি ধরেছিলেন আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উটের হাওদায় বসে ছিলেন। ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। প্রায় সফরের এমনটা ঘটে। পরিশেষে তাঁরা অন্য দলের সাথে মিলিত হলো জোহরের সময় তাঁরা তখন বিশ্রামে ছিল।

সফর শেষে সবাই মদিনায় পৌঁছলেন কিন্তু এদিকে উম্মুল মুমিনের পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আব্দুল্লাহ বিন ওবাই বিন সালুল। যেখানে সেখানে যার তার কাছে অবান্তর সব কথা বলতে লাগল।

এদিকে মদিনায় এসেই এক মাসের মত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলেন। মানুষ অপবাদ রটনাকারীদের কথা চর্চা করতে লাগলো। কিন্তু তার কিছুই আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জানতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা

রাদিয়াল্লাহু আনহা কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আসতেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাঁরﷺ যে স্নেহ পেত অসুস্থতার সময় এই সময় সে স্নেহে কমতি হচ্ছিল। তিনিﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে আসতেন। সালাম দিতেন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছো?" এতে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা সন্দেহে পড়ে কিন্তু মন্দ কিছু আঁচ করতে পারেনি।

কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরের কথা। এক রাতে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মে মিসতাহ বের হলো প্রয়োজন সারতে। চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল উম্মে মিসতাহ। বলে উঠলো, "মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ।" আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তুমি বড় মন্দ বলেছ। বদরে অংশ নেওয়া মহৎপ্রান এক ব্যক্তিকে তুমি গালি দিলে!' উম্মে মিসতাহ বলল, "সরল নারী, তুমি কি শুনোনি সে কি বলেছে?" আমি বললাম, 'কি বলেছে?' এরপর উম্মে মিথ্যা অপবাদ রটনার সকল কথা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জানালো। ফলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে গেল। বাড়িতে ফিরে আসলো সে। রাসুল ﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তিনিﷺ বললেন, "কেমন আছো?" আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, "আপনি কি আমাকে বাবা মার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?" আমি চাচ্ছিলাম মা-বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটি নিশ্চিত করি। রাসুল ﷺ অনুমতি দিলেন।

বাবা-মার কাছে চলে গেল। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা মাকে বললো, "মা, মানুষ কী বলাবলি করছে?" মা বললেন, "মেয়ে আমার, বিষয়টা হালকাভাবে নাও। আল্লাহর শপথ, কোনো সুন্দরী মহিলা যদি এমন স্বামীর কাছে থাকে আর স্বামীও তাকে ভালোবাসে, সাথে যদি সে মহিলার কয়েক সতিন থাকে, তবে তারা সে মহিলাকে নিয়ে একটু-আধটু বলেই।" মায়ের কথা শুনে তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ, তাহলে মানুষ ঠিকই এসব রটিয়েছে?।" সে রাতে অনবরত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিলো। একটুও ঘুমাইনি। কাঁদতে কাঁদতে রাত ভোর হলো।

পবিত্রহৃদয় মসলিমগণ এসব শোনামাত্রই হতভম্ব হয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে বলতে লাগলেন-

سُبْحَانَ اللَّهِ !هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ !

আল্লাহ চিরপবিত্র! এ সুস্পষ্ট অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।

আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে আইয়ুব, যদি তোমার ব্যাপারে কেউ এমন মন্তব্য করত, তবে কি তুমি মেনে নিতে? তিনি বললেন, আল্লাহ মাফ করুন, কোনো অভিজাত নারীই তা মেনে নিতে পারেন না। আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অভিজাত। তা হলে তাঁর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কী করে সম্ভব?

মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়াও আরও তিনজন এই কুচক্রে জড়িয়ে পড়ে হাসসান ইবনে সাবিত রাদিআল্লাহু আনহু হামনা বিনতে জাহশ রাদিআল্লাহু আনহা এবং মিসতাহ ইবনে আসাসাহ রাদিআল্লাহু আনহু। অথচ প্রথম দুজন সফরে ছিলেনই না।

হাসসান রাদিআল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ মাফ করুন, ঘটনার শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না; বরং সাফওয়ান রাদিআল্লাহু আনহু-এর বদনামই ছিল তার উপভোগ্য বস্তু। কেননা তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন-উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ তার চেয়ে অধিক সম্মানী হয় কী করে। তাঁর একটি কবিতায়ও সেই মাতমই মেলে:

أَمْسَى الْجَلَابِيْبُ قَدْ عَزُّوْا وَقَدْ كَثُرُوا
ابْنُ الْفَرِيعَةِ أَمْسَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ *

অর্থ: উড়ে এসে জুড়ে বসে নামধামের শেষ নেই ফারিয়া-তনয় ঘরের ছেলে ভ্রুক্ষেপেরও লেশ নেই।

হামনা রাদিআল্লাহু আনহা উম্মুল মুমিনীন জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা-এর ভগ্নি ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এভাবে জল আরও ঘোলা হলে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর জায়গাটা তার বোনই দখল করবেন। অবশ্য মিসতাহ রাদিআল্লাহু আনহু -এর বিষয়টি আশ্চর্যজনক। কেননা প্রথমত তিনি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু -এর ঘনিষ্টজন

ছিলেন, দ্বিতীয়ত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু- এর দান-দক্ষিণায়ই ছিল তার জীবিকা-নির্বাহের বাহ্যিক উপায়।

এদিকে ওহি আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাসুল ﷺ আলি ও উসামাকে স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ডাকলেন। উসামা বিন জাইদ রাসুল ﷺ - এর স্ত্রীর নিষ্কলুষতা জানতেন, জানতেন স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা কেমন, এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসুল, তিনি আপনার স্ত্রী। তাকে আমরা উত্তমই জানি।" অন্যদিকে আলি রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করে দেননি। তিনি ব্যতীত অন্য অনেক নারীই আছেন। আপনি তাঁর দাসী (বারিরা)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে সত্যিটা বলতে পারবে।" এরপর রাসুল ﷺ বারিরাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, "বারিরা, আয়িশার মাঝে কৌতূহল-উদ্দীপক কিছু দেখেছ?" বারিরা বলল, "যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন- তাঁর শপথ, তাঁর মাঝে কখনো আমি দোষের কিছু দেখিনি। তবে তিনি অল্পবয়সী এক কিশোরী। আটা খামির করতে গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর ওদিকে ঘরের বকরিটি এসে তা খেয়ে ফেলে।”

পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা - ই আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর সমকক্ষতার দাবি করতেন। আবার কুৎসা-রটকদের মধ্যে তাঁর ছোটবোন হামনা রাদিআল্লাহু আনহা-ও ছিলেন। তাই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও প্রশ্ন শোনামাত্রই কানে আঙুল দিলেন; যেন এমন কথা শোনাও পাপ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন- আল্লাহর কসম, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -এর ব্যাপারে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু আমি জানি না।
আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, “জাইনাব সর্বদা আমার সাথে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকত। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে এসে তাঁর ধার্মিকতা-দ্বীনদারিতার কারণে নিজেকে সে রক্ষা করতে পেরেছে।

এরপর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীকে মসজিদে নববীতে একত্র করে সংক্ষেপে নবীপরিবারের পবিত্রতা তুলে ধরলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নীচতা ও নিকৃষ্টতার কথাও স্মরণ করালেন। এরপর তিনিﷺ বললেন, “মুসলিম জাতি কে আমাকে সাহায্য করবে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার

আমার পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে? আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর মাঝে ভালো বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথার রটিয়েছে, যাকে আমি উত্তম বলেই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি কখনো।"

আওসের গোত্রপতি সাদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছেড়ে বললেন - আমি হে আল্লাহর রাসুল। যদি সেই ইতর আমাদের আওস গোত্রের হয়, তাহলে এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের মিত্র খাজরাজ গোত্রেরও হয় তবু আপনি শুধু আদেশ দিন, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আওস ও খাজরাজের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কথায় কথায় যুদ্ধপ্রবণতা ছিল বংশপরম্পরাগত। ইসলাম সেই অনভিপ্রেত অগ্নিকে নির্বাপিত করেছিল ঠিকই; কিন্তু ছাইয়ের নিচে চাপাপড়া জ্বলন্ত অঙ্গার তখনো ছিল। সামান্য ফুঁৎকারেও সে অঙ্গার দাউদাউ করে জ্বলে উঠত। খাজরাজের গোত্রপতি সাদ ইবনে উবাদা রাদিআল্লাহু আনহু আওসের গোত্রপতির উৎসাহকে ধৃষ্টতা জ্ঞান করলেন। তিনি ভাবলেন, আওস গোত্রপতি নিজ গোত্রের ব্যাপারে যা-তা করতে পারেন, বলতে পারেন; কিন্তু অন্য গোত্রের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার তার নেই। খাজরাজের ব্যাপারে যা বলার খাজরাজ গোত্রপতিই বলবেন, তিনি এ ব্যাপারে কথা বলার কে? তা ছাড়া ঘটনাচক্রে সেই ইতর খাজরাজ গোত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল। আর হাসান ইবনে সাবিত রাদিআল্লাহু আনহু-এর মামলা তো মিটেই গেছে। তাই তিনি সাদ ইবনে মুআয রাদিআল্লাহু আনহু -কে সম্বোধন করে বললেন-কিন্তু আপনি তো হত্যা করতে পারবেন না, কারণ সে অধিকার আপনার নেই। সঙ্গে সঙ্গে ইবনে মুআয রাদিআল্লাহু আনহু - এর চাচাতো ভাই উসায়েদ ইবনে হুযায়ের রাদিআল্লাহু আনহু কথা ধরলেন। তিনি বলে উঠলেন হে সাদ, এ তো মুনাফিকি! আপনি মুনাফিকদের পক্ষ নিচ্ছেন কী করে?...ব্যস, গোলমাল পাকিয়ে গেল! তুমুল বাগ্বিতণ্ডা থেকে অস্ত্র ধারণের উপক্রম হলো। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে চুপ করালেন। আলোচনা এভাবেই সমাপ্তি পেল।

সেদিন কেঁদে কেঁদে পার করলেন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা। তাঁর চোখের অশ্রু একটুর জন্যও থামেনি। একটুও ঘুমাইনি সেদিন। এরপর রাতটাও কেঁদে কেঁদে কাটালো। একটু সময়ের জন্যও থামেনি তাঁর অশ্রু। স্বল্প মুহূর্তও ঘুমের পরশ পাইনি।

তাঁর মা-বাবা মনে করলেন, কাঁদতে কাঁদতে বুঝি তাঁর কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা দুজন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর পাশেই বসেছিলেন, আর তিনি অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলো। এক সময় এক আনসার নারী প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি দেয়া হলে। সেও আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর কাছে বসে কাঁদতে থাকল। তাঁরা তখন সে অবস্থায়, এমন সময়ে রাসুল ﷺ আগমন করলেন। সালাম দিয়ে পাশে বসলেন। এই ব্যাপারে কথা রটানোর পর থেকে তিনিﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর কাছে বসেননি। এ অবস্থায় এক মাস কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ওহি আসেনি এই সম্পর্কে। রাসুল ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর পাশে বসে শাহাদাহ পড়ে বললেন, "আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ এ সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিষ্পাপ হয়ে থাকো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা ঘোষণা করবেন অচিরেই। আর যদি তুমি কোনো পাপ করেই থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কোনো বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করেন।"

রাসুল ﷺ -এর কথা শেষ হলো। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর চোখ থেকে অশ্রুপ্রবাহ একেবারেই নাই হয়ে গেল। এক ফোঁটা পানিও অনুভব করলো না চোখে। তিনি তাঁর বাবাকে বললেন, "আমার পক্ষ থেকে রাসুল ﷺ -কে উত্তর দিয়ে দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুলﷺকে কী উত্তর দেবো!" এরপর মাকে বললেন, "আমার পক্ষ থেকে রাসুলﷺ কে উত্তর দিয়ে দিন।" তিনিও বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুলﷺকে কী উত্তর দেবো!"

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা তখন অল্প বয়স্কা এক তরুণী। কুরআনও খুব বেশি মুখস্থ হয়নি তখন। তবুও তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি জানি, আপনারা এ ব্যাপারে যা শোনার শুনেছেন। সেটাই আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা-ই আপনারা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন যদি আমি নিজেকে পবিত্র বলি-আর আল্লাহ জানেন

আমি পবিত্র-তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কেননা, আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন। আর যদি না-করা পাপটি আমি স্বীকার করে নিই-আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র-তবে আপনারা আমাকে মিথ্যের ব্যাপারটিতে বিশ্বাস করে নেবেন। এ জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে-ই উদাহরণই যুৎসই, যা ইউসুফ আলাইহিসসালাম এর পিতা ইউসুফ আলাইহিসসালাম -এর ভাইদের বলেছিলেন-

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

"ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।"

(সুরা ইউসুফ:১৮)

কথাগুলো বলে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে।

[আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা জানতেন তিনি নিষ্পাপ এবং আল্লাহ তাঁকে নিষ্পাপ ঘোষনা করবেন। কিন্তু তিনি ভাবেন নি তাঁর ব্যপারে কুরআনের পাঠ হিসেবে ওহি নাজিল হবে। সবাই তা তিলাওয়াত করবে। তাঁর ধারনা ছিলো হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সপ্নের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করবেন।]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বসার থেকে উঠেননি।ঘরের কেউ বের হয়নি। এরই মধ্যে আল্লাহ সাত আসমানের ওপার থেকে উম্মুল মুমিনীনের পবিত্রতা ঘোষনা করেছেন।রাসুল ﷺ এর উপর ওহি নাজিল হওয়া শুরু হলো।শীতের সময়ও তিনিﷺ ঘেমে যাচ্ছেন। তাঁরﷺ শরীর থেকে মুক্তোর মতো ঘামের ফোঁটা ঝরা শুরু করছে।

ওহি নাজিলের কষ্ট শেষ হলে, রাসুল ﷺ হাসছেন। তিনি প্রথম যে শব্দটি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে, "সুসংবাদ নাও আয়িশা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।"

তখন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর মা তাঁকে বললেন, "যাও, উঠে রাসুল ﷺ -এর কাছে যাও। (তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।)" আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা নারীসুলভ অভিমানের সঙ্গে বললেন "আল্লাহর শপথ, না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব। তিনিই আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন।

আল্লাহ নাজিল করেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِا لْاِ فْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِ ثْمِ ۚ وَا لَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ

"যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি।"

لَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بِاَ نْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَا لُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ

"তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।'"

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَ رْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِ ذْ لَمْ يَاْتُوْا بِا لشُّهَدَآءِ فَاُ ولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

"তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যেবাদী।"

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَا لْاٰ خِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَاۤ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ

"দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত।"

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَ لْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَ فْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

"যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার।"

وَ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَـنَآ اَنْ نَّـتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَا نٌ عَظِيْمٌ

"তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!"

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।"

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمُ الْاٰ يٰتِ ۗ وَا للّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা।"

ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَا حِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَا بٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَا لْاٰ خِرَةِ وَا للّٰهُ يَعْلَمُ وَاَ نْـتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।"

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَ نَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ দয়ার্দ্র, বড়ই দয়াবান।"

(সুরা নূর:আয়াত-১১-২০)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সূরা নূরের ১০ আয়াত। আল্লাহ তায়ালা এ সকল আয়াত আমার নিষ্কলুষতা ঘোষণায় নাযিল করেছেন।

(সহিহ বুখারী-২৬৬১)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَا لْاٰ خِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ

"যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি।"

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَ يْدِيْهِمْ وَاَ رْجُلُهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত, তাদের পা- তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে।"

(সুরা নূর:আয়াত-২৩-২৪)

এরপর অপবাদ আরোপকারী ওই তিন অপরাধীকে ঐশী বিধান মোতাবেক আশিটা করে চাবুকাঘাত করা হলো। পরবর্তীতে হাসসান রাদিআল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -এর সম্মানে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন-বলা যায়, কাফফারাস্বরূপ। ইবনে ইসহাক সীরাতে সেই কবিতা-পঙ্ক্তিগুলোর উল্লেখ করেছেন। বুখারী শরীফে এসেছে- হাসসান রাদিআল্লাহু আনহু স্বরচিত কয়েকটি পঙ্ক্তি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা -কে শুনিয়েছিলেন। তিনি যখন নিম্নোক্ত পঙক্তিটি বলেছিলেন-

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ *وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ خُوْمِ الْغَوَافِلِ

অর্থ: তিনি পবিত্র, ধৈর্যশীলা, নিষ্কলঙ্ক-নির্দোষ। সরলা নারীকে দোষারোপ করা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

তখন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেছিলেন সত্য বলেছ, কিন্তু তুমি এমন মানুষ ছিলে না। অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তার জড়িত থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত করতেই আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা কথাটি বলেছিলেন।

ইফকের ঘটনা থেকে আমরা যা শিক্ষা পাই তা হলো:-

- **গুজবে কান না দেয়া:** কোন কিছু যাচাই-বাছাই না করেই প্রচার করা থেকে বিরত থাকা। পরবর্তীতে সঠিক টা সামনে আসলে নিজেই এতে অপমান হয়। হুট করেই কিছু শুনে তা বিশ্বাস না করা এবং তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত না।
- **সবর করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা:** যতই বিপদ আসুক সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য সহকারে বিপদ মোকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।
- **সন্দেহ ও অপবাদ থেকে দূরে থাকা:** কারো কোন কিছু তে সন্দেহ হলে তৎক্ষনাৎ অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। হতে পারে যা শুনি বা দেখি তা সঠিকও না। কোন কিছু সঠিক প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কারো বিষয় মিথ্যা অপবাদ রটানো গুনাহের সামিল। এবং ইসলামে এরজন্য শাস্তির ও ব্যবস্থা আছে।
- **বিপদে মানুষ চেনা:** বিপদে পরলে কাছের মানুষ চেনা যায়।যাদের মধ্যে মুনাফেকি আছে তাদের আসল রূপ বেরিয়ে আসে।

ইফকের ঘটনার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কেমন আচরণ ছিলো তা থেকেও আমরা শিক্ষা পাই;-

- রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর উপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা প্রথমে শুনেই সে বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেন নাই। তিনিﷺ চুপ থেকে সব পর্যবেক্ষণ করেছেন। স্ত্রীর বিষয় এমন কথা শুনে স্ত্রীর উপরও রাগ দেখান নাই কিংবা তাঁকে সরাসরি প্রথমে কিছু জিজ্ঞেস ও করেন নাই।
- তিনিﷺ এমন ঘটনার পর স্ত্রীর সাথে তাঁরﷺ আচরনের পরিবর্তন করেছেন। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা অসুস্থ থাকায় তাঁর খোঁজ খবর নিয়েছেন কিন্তু আগের মতোন তেমন স্নেহ করেন নাই। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যেন স্ত্রী বুঝে তার কোন দোষ আছে কিংবা তার বিষয় কিছু হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সরাসরি স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাননি কারণ এখনো প্রমানিত হয়নি স্ত্রীর দোষ আছে কিনা। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর খোঁজ খবর নিতেন,তাঁর অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতেন।

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,
'এ হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ হবে স্নেহপূর্ণ ও উত্তম আচরণ। কিন্তু স্বামীর কাছে স্ত্রীর মন্দকর্ম সম্পর্কে কোনো সংবাদ আসলে সত্যতা নিশ্চিত না হয়ে স্বামী তৎক্ষণাৎ সংবাদের ওপর পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। বরং পূর্বের স্নেহপূর্ণ আচরণ কমিয়ে দেবে। এ রকম আচরণনীতির সুফল হচ্ছে, স্বামীর আচরণে পরিবর্তন দেখে স্ত্রী কারণ অনুসন্ধান করবে,যদি স্ত্রী অপরাধ করে থাকে,তবে স্বামীর কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে।

ইমাম নববি বলেন, 'ইফকের হাদিসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। একটি শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, যখন স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে মন্দ কিছু শুনবে, তখন স্নেহ ও আদরে কমতি করবে। যাতে স্ত্রী স্বামীর সোহাগ কমে যাওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে স্বামীর কাছে এবং স্বামীর মনের সন্দেহ দূর করে দিতে পারে।'

- রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘটনা শুনার বেশ অনেকদিন পর পরামর্শ করলেন কাছের কয়েকজনের সাথে। স্ত্রীদের মধ্যে যে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর সাথে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকতো তাঁকে ও জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। এর মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে, কারো প্রতি কোন অপবাদ শুনা গেলে আগে তাঁর কাছের মানুষদের কে জিজ্ঞেস করা উচিত মানুষ টা কেমন। একা একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে কাছের বিশ্বস্ত মানুষের সাথে পরাপর্শ করা উচিত
- অতঃপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার সাথে কথা বলে বুঝতে আর বাকি রইলো না রাসুলুল্লাহ ﷺ কে কষ্ট দেয়ার জন্য মুনাফিকেরা এমন ষড়যন্ত্র করেছে।
- পরিশেষে তিনিﷺ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর সাথে কথা বললেন । নসিহাহ করলেন এবং উপদেশ ও দিলেন। রাসুলুল্লাহﷺ ওহি নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করেছিলেন অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর পবিত্রতা ঘোষনা করলেন।

ইমাম নববি বলেন, 'ইফকের ঘটনা ছিল মুনাফিকদের নিরেট ষড়যন্ত্র। ওহির মাধ্যমে কুরআন মাজিদের নস দিয়ে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা - এর পবিত্রতার ঘোষণা এসেছে। ইমামদের ঐক্য মতে, এরপরও কোনো মানুষ যদি এ নিয়ে সন্দেহ করে নাউজুবিল্লাহ-সে কাফির মুরতাদ হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সন্তানদের সঙ্গে যেমন আচরণ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবারের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর আচরণকারী হিসেবে। নিজ পরিবারের স্ত্রীদের পাশাপাশি সন্তান নাতি নাতনিদেরও উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিতেন। তাদের প্রতি ছিলেন অনেক বেশি যত্নবান। তাদেরকে অনেক মুহাব্বত করতেন।

রাসুল ﷺ এর সন্তানসন্ততি

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর তিন জন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনজন ই ছোট থাকতেই ইন্তেকাল করেন।
কাসিম,আব্দুল্লাহ, ইবরাহিম।

রাসুল ﷺ এর চারজন কন্যা সন্তান ছিলো।তাঁরা সবাই খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন - জাইনাব,রুকাইয়া,উম্মে কুলসুম,ও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহুমা।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এক ছেলে এবং চার জন কন্যাসন্তান এবং নবুয়ত প্রাপ্তির এর একজন ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা এর গর্ভে সবাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অনেক বছর পর মারিয়া কিবতিয়া রাদিআল্লাহু আনহা এর ঘরে ইবরাহিম জন্মগ্রহণ করেন।

আযান - ইকামত

জন্মের পর পিতামাতার ওপর সন্তানের যে হক, তার মধ্যে প্রথম হলো-সন্তানের কানে আজান-ইকামত দেওয়া। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান ইবনে আলির কানে আজান দিতে দেখেছি।

(সুনানুত তিরমিজি : ১৫১৪)

তাহনিক

তাহনিক অর্থ খেজুর চিবিয়ে নরম করে শিশুকে খাওয়ানো। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পথে কুবাপল্লিতে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর জন্মগ্রহণ করেন। নতুন বাবুকে নবীজির ﷺ দরবারে নিয়ে আসা হলো। নবীজি ﷺ তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখের ভেতর সামান্য থুতু লেপ্টে দিলেন। তারপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করলেন। এরপর নবীজি ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন।

(সহিহ বুখারী ইফা,:৫০৭৩)

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, লোকেরা তাদের সদ্যোজাত শিশুদেরকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসত। তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন এবং 'তাহনিক' সম্পাদন করতেন। (সহিহ মুসলিম ইফা,:৫৫৫)

দু'আ

তাহনিকের সাথে সাথে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা জাকারিয়া আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করে নবীজি ﷺ - এর মাধ্যমে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন সন্তানের জন্মের আগে থেকেই পরিশুদ্ধ সন্তানের জন্য দুআ শুরু করতে হবে। বলতে হবে-

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূতপবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সুরা আলে ইমরান:৩৮)

একই সুরার ৩৫ নম্বর আয়াতে আছে-

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।

তারপর সূরা ফুরকানে আছে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন। এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।(ফুরকান:৭৪)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন আর বলতেন, এভাবেই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর দুই ছেলে ইসহাক ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্য আশ্রয় চাইতেন। তিনি হাসান ও হুসাইনের জন্য এই দুআ পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-

أُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও সকল প্রকার বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(সহিহ বুখারী:ইফা,৩১৩২)

উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক উরুতে বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন আরেক উরুতে। তারপর দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুআ করতেন-

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا؛ فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا

'হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, তুমিও তাদেরকে রহম করো।(সহিহ বুখারী:ইফা,৬০৩৮)

সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা

সন্তানদের সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা মা-বাবার হকের মধ্যে পড়ে। সাহাবিরা পিতার ওপর সন্তানের হকের বিষয় জানতে চাইলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'পিতা সন্তানের অর্থপূর্ণ ভালো নাম রাখবে এবং তাকে সুশিক্ষা দেবে।'

সুফিয়ান সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"বলা হত, পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে পিতা সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখবে সন্তান বালেগ হলে তাকে বিয়ে দেবে তাকে হজ করাবে এবং সন্তানকে উত্তম আদব শেখাবে।"

আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তানের নামের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাই সবগুলোই অনেক সুন্দর নাম ছিল তিনিﷺ সবসময় সুন্দর নাম রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং মন্দ অর্থের নাম পেলে তা বদলে নতুন নাম দিতেন।

মুনজির বিন আবুল উসাইদকে এনে নবীজিরﷺ কোলে রাখা হলো। নবীজিﷺ তখন একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কোলের শিশুটার প্রতি সেই মুহূর্তে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারলেন না। শিশুর পিতা পাশেই ছিলেন। নবীজিরﷺ ব্যস্ততা দেখে তিনি ছেলেকে সরিয়ে নিলেন। একটু পর নবীজিরﷺ ব্যস্ততা শেষ হলে বাচ্চাটির খোঁজ নিলেন। বাবুটা কোথায় গেল?

আবুল উসাইদ বললেন, আপনি ব্যস্ত দেখে তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

নবীজিﷺ বললেন, কী নাম রেখেছ?

-ফুলানা!

নবীজি ﷺ বললেন-না, তার নাম 'মুনজির' রাখবে।

(আদাবুল মুফরাদ:৮২৩)

নবীজি ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।
(আবু দাউদ:৪৯৫০)

আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, "আজ রাতে আমার এক ছেলের জন্ম হয়েছে। আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের নামে রাখলাম।" (সহিহ মুসলিম:২৩১৫)

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়,পূর্বপুরুষদের কারো ভালো নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা কিংবা নবীদের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা সুন্নাহ।

চুল কাটা, আকিকা করা এবং খতনা করা

চুল কাটা

বাচ্চার সাতদিনের দিন চুল কাটা ও চুল পরিমাণ রৌপ্য সাদাকা করা এবং আকিকা করা সুন্নাহ।

আবু রাফে রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, "হাসান রাদিআল্লাহু আনহুর জন্ম হলে নবীজি ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দেন,তাঁর আকিকা করো না; বরং তুমি তাঁর মাথার চুল মুন্ডিয়ে দাও

এবং চুলের পরিমান রূপা সাদাকা করে দাও। এরপর হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এর জন্ম হলে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা একই কাজ করেন।" (মুসনাদে আহমাদ:২৬৬৫৫)

নবীজি ﷺ নিজেই নাতির আকিকা দিবেন তাই আকিকা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

অন্য আরেকটা হাদিসে আছে যে, "নবীজি ﷺ শিশুর চুল কাটার পর শিশুর মাথায় 'খালুক' লাগাতে বলতেন। খালুক হলো জাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধি দিয়ে তৈরি লাল-হলুদ সুগন্ধি বিশেষ। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,জাহেলি যুগে শিশুর জন্ম হলে লোকজন পশুর রক্তে তুলো ভিজিয়ে শিশুর মাথা মুন্ডানোর পর রক্তমাখা তুলাটি শিশুর মাথায় রেখে দিত। নবীজি ﷺ বলেন,

اجعلوا مكان الدم خلوقًا

'তোমার রক্তের পরিবর্তে খালুক মালিশ করে দাও।'
(সুনানে আবু দাউদ:২৮৩৮)

আকিকা:

আকিকা হলো সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পশু জবাই করা। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা।
সামুরাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"প্রত্যেক শিশু তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু জবাই করা হবে, তার মাথার চুল মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।" [সুনান আবূ দাউদ: ২৮৩৮]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'নবীজি ﷺ সপ্তম দিনে হাসান ও হুসাইনের আকিকা করেন ও তাঁদের নাম রাখেন।(সহিহ ইবনে হিব্বান:৫৩১১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, নবীজি ﷺ হাসান ও হুসাইনের আকিকায় দুটি করে মেষ জবেহ করেন।

(সুনানে নাসায়ি:৪২১৯)

খতনা করা:

খতনার ইতিহাস মানব ইতিহাসের প্রথম দিকেই শুরু হয়। সর্বপ্রথম এই সুন্নত পালন করেছিলেন নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম।

ইসলামের চার মাজহাবের মধ্যে খতনার হুকুম নিয়ে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে:
হানাফি, মালিকি ও হাম্বলি মাজহাব: খতনা করা হলো 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা' (গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত)।
শাফেয়ি মাজহাব: খতনা করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব।

পুত্র হলে খতনা করা। ঈমানি পরিচয়ের সাথে সাথে খতনা সন্তানকে রোগব্যাধি থেকেও রক্ষা করে। এটা মুসলমানের নিদর্শন, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের রীতি। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবরাহিম আলাইহিসসালাম ৮০ বছর বয়সে তাঁর খতনা করেছিলেন।(সহিহ বুখারী,ইফা:৩১১৯)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"ফিতরাত (তথা নবীদের সুন্নত) হলো পাঁচটি—খতনা করা, নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উঠানো, গোঁফ ছোট করা এবং নখ কাটা।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬২৯৭)

ইবনে শিহাব জুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেন,
“কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে,তখন সে বড়ো হলেও তাকে খতনা করার আদেশ করা হতো।”

(সুনানে আবু দাউদ :৪৯৫)

❀

সন্তানদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ

নবীজি ﷺ এর সন্তানদের মধ্যে ৪ জন মেয়েই জীবিত ছিলো। চার জন মেয়েকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক বেশি মুহাব্বত করতেন। সম্মান করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,কাউকে যদি কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়,আর সে যদি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে- তবে তারা জাহান্নাম ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

(সহিহ বুখারী:৫৯৯৫)

কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করার অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষকে কন্যা সন্তান দিয়ে যাচাই করেন - পিতা মাতা তার সঙ্গে কেমন আচরণ করে। ভালো নাকি মন্দ!যে ভালো আচরণ করবে তার জন্য কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারন হবে। কারন, কন্যা সন্তান বেশ দূর্বল হয় এবং অধিক রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন পড়ে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মেয়েদের বিয়ে

নবীজি ﷺ নিজে পাত্র পছন্দ করলেও নিজের মত মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেননি। তিনিﷺ বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। আলী রাদিআল্লাহু আনহু - ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -এর বিয়ে নিয়ে নানা বর্ণনা আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও উমর রাদিআল্লাহু আনহু এর মতো সাহাবিরাও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং নবীজি ﷺ বিনয়ের সাথে আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করতে বলেন। অতঃপর উমর রাদিআল্লাহু আনহু আলী রাদিআল্লাহু আনহু কে শিখিয়ে দেন প্রস্তাব দেওয়ার জন্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর নিকট একটি বর্ম ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবুও তিনি সাহাবাদের কথা শুনে যখন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন, নবীজি ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলী তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে' ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা চুপ করে রইলেন। সম্মতি আছে বুঝতে পেরে নবীজি ﷺ বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/২০)

পাত্র হিসেবে নবীজির ﷺ কাছে আলী রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন অতুলনীয়। দরিদ্রতার ব্যাপারটা ব্যতীত বংশ, মর্যাদা, দ্বীনদারি, সবকিছুতেই সেরা ছিলেন তিনি। তারপরও নবীজি ﷺ মেয়ের সম্মতি নিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! কেমন করে তার অনুমতি নেওয়া হবে? তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার অনুমতি।(সহিহ মুসলিম : ১৪১৯)

হাদিসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। জোর করে নিজ স্বার্থে মেয়েকে কারো সাথে বিয়ে দেয়া অনুচিত কাজ এবং হারাম। মেয়ে সন্তান মা বাবার কাছে আল্লাহর দেয়া আমানত। এই আমানতের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। যার তার কাছে বিয়ে দেয়া মানে আমানতের খেয়ানত করা। উত্তম আখলাক দ্বীনদার মানুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর চার মেয়েকে উত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। সবার সম্মতি জেনেই বিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ো কন্যা জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে দিয়েছিলেন জাইনাবের খালাতো ভাই আবুল আস বিন রবির সাথে। সম্পদে, বংশে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আবুল আস ছিলেন কুরাইশের অন্যতম সেরা যুবক। তিনি স্ত্রীকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এরপর নবীজি ﷺ নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন। জাইনাব সাথে সাথে ঈমান আনলেও আবুল আস ঈমান আনলেন না। তার ভয় ছিল লোকেরা স্ত্রৈণ বলে কিনা! নিজে মুসলিম না হলেও মুসলিম হওয়ার কারণে স্ত্রীকে কখনো কষ্ট দেননি। তাকে মুশরিকের জিন্দেগি যাপন করতে জোর করেননি।

পরবর্তীতে মদিনায় হিজরতের পর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা এর সঙ্গে সংসার করেন

দ্বিতীয় মেয়ে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা এর বিয়ে হয় উসমান রাদিআল্লাহু আনহু এর সঙ্গে। বদরের যুদ্ধের পর রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা মারা যান। এরপর নবীজি ﷺ তৃতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা কে উসমান রাদিআল্লাহু আনহু এর সঙ্গে বিয়ে দেন। পরবর্তীতে উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা ও মারা যান।
উম্মে কুলসুম মারা যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমার যদি দশটি মেয়ে থাকত, তাহলে একের পর এক সকলকে উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম। (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৮/২০)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছোট কন্যা ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর সঙ্গে বিয়ে দেন।
আলি রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুল ﷺ -এর চাচাতো ভাই। শিশুদের মধ্যে আলী রাদিআল্লাহু আনহু -ই প্রথম ইমান আনেন রাসুল ﷺ -এর প্রতি। ইসলাম-পূর্ব যুগে আলী রাদিআল্লাহু আনহু রাসুল ﷺ - এর কাছে লালিতপালিত হন। নবুওয়াতের পর পর্যন্ত রাসুল ﷺ -এর সাথেই ছিলেন আলী রাদিআল্লাহু আনহু। নবীজি ﷺ তাঁকে ভালোবাসতেন, তাঁকে কাছে টেনে নিতেন। আলী রাদিআল্লাহু আনহু জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

মোহরানা

নবীজি ﷺ মেয়েদের বিয়েতে খুব বেশি মোহরানা নির্ধারণ করতেন না।
ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি ফাতেমাকে বিয়ে করলাম। আমাকে নবীজি ﷺ বললেন, 'তাকে কিছু দাও।' আমি বললাম, 'আমার তো কিছুই নেই।' তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'তোমার 'হুতামি' বর্মটা কোথায়?' আমি বললাম, 'আমার সাথে আছে।' তিনি তাকে সেটিই দিতে বললেন।"
(আবু দাউদ :২১২৫)

ইবনে আসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, "হুতামি বর্ম হুতামা ইবনে মুহারিব নামের এক গোত্রে তৈরি হতো। কিংবা এর অর্থ শব্দগতভাবেও হতে পারে-অর্থাৎ, এটি তরবারিকে ভেঙে ফেলে।"

আজকাল আমাদের সমাজে মোহর টা এমন ভাবে দেখা হয় যেন স্বামী সহজে বউকে তালাক দিতে না পারে। মোহরের সঙ্গে ডিভোর্স কে জড়িয়ে রাখে।
অথচ মোহর হচ্ছে মেয়ের অধিকার যা সম্পূর্ণ দিয়ে বিয়ে করা সুন্নাহ। ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করা উচিত।
আমরা এমন ভাবে ধার্য করি যা ছেলে বা ছেলের পরিবারের পক্ষের দেয়া কখনোই সম্ভব না। বিয়ে করার পর আর এই মোহরের টাকা দেয়া হয় না। তখন স্বামী বউয়ের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। এভাবেই চলে আসতাছে আমাদের সমাজের নিয়মগুলো। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিস খেয়াল করলে দেখা যাবে। ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলে মোহরের টাকা শোধ করেই স্ত্রীকে ঘরে উঠাচ্ছে। মোহর বেশি ধার্য করা যদি সম্মানের বিষয় হতো তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মেয়েদের মোহর হতো অনেক বেশি পরিমানে। ফাতেহা রাদিআল্লাহু আনহা হচ্ছেন জান্নাতের নারীদের প্রধান। এমন একজন সম্মানিত নারীর মোহর কেমন ছিলো তা আমরা উপরের আলোচিত বিষয় থেকেই বুঝতে পারছি।

বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাসস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন

মেয়ের বিয়ের পর তাকে হাদিয়া দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে জামাইয়ের আর্থিক অবস্থা যদি একেবারেই কম থাকে। নবীজির ﷺ অন্য মেয়েদের স্বামী আবুল আস ও উসমান বিত্তশালী ছিলেন। কিন্তু আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর কাছে কেবল একটি ভেড়ার চামড়া ছিল, সেটি বিছিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন, আর দিনে মশকের কাজে ব্যবহার করতেন। তার কোনো দাস-দাসী ছিল না। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে স্বামীর বাড়ি পাঠানোর সময় নবীজি ﷺ একটা গালিচা পাঠিয়েছিলেন। আরও দিয়েছিলেন খেজুর পাতার আঁশ দিয়ে বানানো চামড়ার একটি বালিশ। যাঁতা, পানির মশক আর দুইটি কলসও দিয়েছিলেন।(মুসনাদে আহমাদ:৮২১)

ছেলের যদি সামর্থ্য কম থাকে তাহলে মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ের পর সাংসারিক জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সমাজে ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষের কাছে এমন আবদার করে যা মেয়ে পক্ষ থেকেই জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে

যায়। জমি বিক্রি করা কিংবা কারো থেকে সুদে টাকা নিয়ে হলেও মেয়ের সাথে অনেক জিনিস পত্র দিতে হয়। যা এক প্রকার জুলুম।

উপরের হাদিসে দেখা যাচ্ছে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বড় মেয়েদের সাথে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদেরকে কোন কিছু দেয়ার প্রয়োজন হয়নি।কারণ বাকি মেয়েদের স্বামীরা ছিলো বিত্তশীল।কিন্তু আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর কাছে তেমন কিছু ছিলো না।ছোট থাকতেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বড় হয়েছেন। বাইরে গিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পাননি। পরবর্তীতে ইসলাম প্রচার করা,বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া এসব কারণে তিনি কিছু করার সুযোগও পাননি। তাই কিছু জিনিসপত্র মেয়ের সাথে দিয়েছেন।

অলিমা করা

অলিমা হচ্ছে, বিয়ের ভোজ। শব্দটি এসেছে ওয়ালাম শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে একত্র করা। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হয়, তাই এ ভোজকে অলিমা বলে। (লিসানুল আরব:১২/৬৪৩)

জুমহুর আলিমের মতে, এটি মুসতাহাব।

বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “যখন আলী রাদিআল্লাহু আনহু নবীজির ﷺ কাছে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি বললেন, "বিয়েতে অবশ্যই ভোজের আয়োজন থাকতে হবে।" তখন সাদ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন যে, তিনি একটি ভেড়া আনবেন; অন্য আরেক সাহাবী বললেন, তিনি অমুক পরিমাণ গম আনবেন।" (মুসনাদে আহমাদ:২২৫২৬)

বিয়ের পরের দিন অলিমা করা উত্তম। তবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে শরয়ি কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

বর ও কনের জন্য দু'আ করা

বাসর রাতে নবীজি ﷺ বলে দিয়েছিলেন, আলী রাদিআল্লাহু আনহু কে আমার সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষা করো। আমি আসব। মসজিদে নামাজ শেষ করে নবীজি ﷺ এসে নিচে ধরে রাখা পাত্রের মধ্যে অজু করলেন। তারপর অজুর পানি আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তারপর দুআ করলেন-

اللهم بارك فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنائِهِما.

'হে আল্লাহ! তাদেরকে বরকত দান করুন। তাদের বংশধরের মধ্যে বরকত দান করুন।(মুজামুল কাবির,১১৫৩)

একটি বর্ণনায় আছে, যাওয়ার সময় মেয়েকে নবীজি ﷺ বললেন-ফাতেমা, আমার পরিবারের সবচেয়ে ভালো সদস্যের সাথে তোমার বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করিনি।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ,৮/১৫-২৮)

স্বামী-স্ত্রীর জন্য বরকতের দোয়া করা মুসতাহাব। নবীজি ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন, 'بَارَكَ اللهُ لَكَ' আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।(সহিহ বুখারী:৫১৫৫)

বিয়ের পরও মেয়ের দেখাশোনা

কন্যাদের বিয়ের পরও শত ব্যস্ততার মাঝেও রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের খোঁজখবর নিতেন। দেখভাল করতেন। তাঁদের বিষয় চিন্তা করতেন। সংসারে কোন সমস্যা হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তা মিটিয়ে দিতেন। তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।

একদিন রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি উসমানের মাথা ধুইয়ে দিচ্ছেন। নবীজি ﷺ বললেন, 'আমার মামণি, তুমি আবু আবদুল্লাহর (উসমান) সাথে

ভালো ব্যবহার করবে। কারণ আমার সাহাবিদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে তার বেশি মিল। (আল ইসাবা,৪/৩০৫)

নবীজি ﷺ যখন বদর অভিযানে বের হন। তখন তাঁর কন্যা রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা অসুস্থ। একটু পরে তাঁকে কুরাইশ ও কুরাইশের প্রবল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ভীষণ এক বাস্তবতা তাঁর সামনে। কিন্তু তবুও তিনি কন্যার অসুস্থতার কথা ভুলে যাননি। রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর স্বামী উসমান বিন আফফান রাদিআল্লাহু আনহু এ-কে তিনি মদিনায় থাকার আদেশ করলেন। যাতে রুকাইয়ার দেখাশোনা করতে পারেন। তিনিﷺ তাঁকে গনিমতের অংশ তো দিলেনই এবং বললেন, আল্লাহর কাছে তিনি জিহাদের সওয়াবও পাবেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে কেউ একজন উসমান রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইঙ্গিতে অসংলগ্ন মন্তব্য করল। জবাবে ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ হচ্ছে-রাসুলﷺ এর সাহেবজাদি রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন উসমানের স্ত্রী। বদরের সময়টাতে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা বেশ অসুস্থ ছিলেন। তাই নবীজি ﷺ তাঁকে মদিনায় থেকে যাওয়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, "তোমার জন্য বদরে যোগদানকারীর প্রতিদান রয়েছে এবং রয়েছে বদরের গনিমতের অংশও।"

(সহিহ বুখারী ৩১৩০)

আরেকদিন নবীজি ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর ঘরে যান। গিয়ে দেখেন ঘরে আলী রাদিআল্লাহু আনহু নেই। নবীজি ﷺ বললেন-'তোমার চাচার ছেলেটি কোথায়?'

ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন-'তাঁর ও আমার মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়েছে, তাই আমার সাথে রাগ করে বেরিয়ে গেছেন।'

নবীজি ﷺ এক লোককে ডেকে বললেন-'একটু দেখো তো, সে কোথায় গেল?'

লোকটি একটু পরেই ফিরে এসে বলল-'ইয়া রাসুলুল্লাহ, তিনি তো মসজিদে শুয়ে আছেন।'

নবীজি ﷺ মসজিদে এলেন। দেখলেন ঠিক তাই। আলী রাদিআল্লাহু আনহু এমনভাবে শুয়ে আছেন একপাশ থেকে পরিধেয় চাদর সরে গিয়েছে। শরীরে মাটি লেগে আছে। কাছে গিয়ে নবীজি ﷺ মাটি মুছে দিতে দিতে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন- 'ওহে আবু তুরাব! ওহে মাটিওয়ালা! ওঠো ওঠো!

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, 'এই হাদিসে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিশেষ শিক্ষা হলো-মেয়ের সাথে জামাই রাগ করলে জামাইয়ের রাগ ভাঙানোর জন্যে শ্বশুরকে একটু মনোরঞ্জন করা, খোশামোদ করার মধ্যেই সমাধান হয়ে যেতে পারে সহজে। নবীজি ﷺ নিজে গিয়েছেন জামাইয়ের কাছে। নিজ হাতে ধুলি ঝেড়ে দিয়েছেন। রসিকতা করে একটি আদুরে উপনামও দিয়েছেন। এত আদরের ডাক শুনে কার রাগ পানি হবে না!

(ফাতহুল বারি ১/৫৩৬)

কিন্তু আমরা একটু আশপাশে তাকালেই দেখতে পারবো, মেয়ের সাথে জামাইয়ের মনোমালিন্য হলে দুই পরিবারের অবস্থা কি হয়। ঝগড়াঝাঁটি মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে দু'টি পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটে। বড়রা চাইলেই পারে শান্ত হয়ে বসে আলাপ করে আল্লাহর বিধান রাসুল ﷺ এর হাদিস অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু আমাদের মাঝে দাম্ভিকতা চলে আসে। কেউ কারো কাছে নত স্বীকার করতে চায় না। সবাই উপরে থাকতে চায়। এই দাম্ভিকতার মধ্যে দিয়ে দুটি পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটে। পরে স্বামী স্ত্রী আফসোস করে। কখনো আফসোস করতে করতে এলাকার আলেমের শরণাপন্ন হয়, মাসায়ালা জানতে চায় বিয়ে ভেঙ্গে গেলো কিনা।

কন্যাদের কেউ তাঁর কাছে বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বাবার বাড়ি বেড়াতে যেতেন প্রায়ই। মেয়ে বেড়াতে গেলে নবীজি ﷺ দারুণ খুশি হতেন! আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলাফেরা, ওঠা-বসা, আদব-আখলাকে ফাতেমার চাইতে অধিক সাদৃশ্য আর কারও সাথে দেখিনি। যখন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজির

ﷺ খেদমতে আসতেন, নবীজি ﷺ এগিয়ে যেতেন, কন্যাকে চুমু দিতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর যখন নবীজি ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর গৃহে প্রবেশ করতেন,তিনিও স্থান ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন, পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। (সুনানে আবু দাউদ :৫২১৭)

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুলﷺ ফাতেমার হাত ধরে তাঁকে চুমু খেলেন।' রাসুল ﷺ এটি ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর সম্মানার্থে করতেন।

উপহার প্রদান

সন্তানকে উপহার প্রদান করা সুন্নাহ।
নবীজি ﷺ মেয়েদেরকে উপহার দিতেন।
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমি সূচিকর্ম খচিত একটি চাদর উপহার দেওয়া হলো। যার টানা অথবা পড়ন ছিল রেশমি সুতার। তিনি ﷺ সেটি লোক মারফত আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা দিয়ে আমি কী করব, আমি কি এটা পরব? তিনি বলেন, না এটা দ্বারা ফাতেমার ওড়না বানিয়ে দাও।
(সুনানে ইবনে মাজাহ)

ফাতেমারা হলেন-ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলির আম্মু ফাতেমা বিনতে আসাদ।

দুনিয়াবিমুখতা শিক্ষা দেয়া

একবার নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর ঘরে গেলেন। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এলে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে ঘটনা জানালেন। আলী রাদিআল্লাহু আনহু নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে নবীজি ﷺ বললেন, 'আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের

সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?' আলী রাদিআল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর কাছে এসে সব বললে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, 'তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিলেন।' তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের কাছে এটা পাঠিয়ে দাও; তাদের অনেক প্রয়োজন। (সহিহ বুখারী ইফা, ২৪৩৮)

পর্দাটাতে নকশা করা ছিলো। এমন পর্দা ব্যবহার করা হারাম এমন না। তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াবি চাকচিক্য পছন্দ করতেন না। নিজে যেমন পছন্দ করেন না তেমনি নিজের সন্তান স্ত্রীর জন্য তিনিﷺ পছন্দ করতেন না। তিনিﷺ চাইতেন না তাঁর সন্তান দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ুক।
এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ সন্তানকে কিছু বলেন নি ধমক ও দেননি।বাবার চলে যাওয়া দেখে মেয়ে বুঝতে পেরেছেন কিছু একটা হয়েছে এরপর খবর নিয়ে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়েছে তাই তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ফেলেন।

আরেকবারের কথা,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ "عَلَى مَكَانِكُمَا ."فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ "أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ".

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার রহিমাহুল্লাহ .... আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদিন (আমার নিকট) অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবীজি (ﷺ)- এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা (এক জন গোলাম পাওয়ার আশা নিয়ে) নবীজি (ﷺ)- এর খেদমতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা- এর কাছে তাঁর কথা বলে আসলেন। নবীজি (ﷺ) যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতেমা

রাদিআল্লাহু আনহা- এর আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে অবহিত করলেন। (আলী রাদিআল্লাহু আনহা বলেন) নবীজি (ﷺ) আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবনা? (তা হল) তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" পড়ে নিবে। এটা খাদিম (যা তোমরা চেয়েছিলে) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪০ (আন্তর্জাতিক নং ৩৭০৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এখানে কত উত্তম ই না আচরণ করেছেন মেয়ের এবং মেয়ের জামাইয়ের সাথে। এমন একটা আমল শিখিয়েছেন যা এখন মুসলিম উম্মাহ আমল করে।
মেয়েকে খাদেম না দেয়াতে মেয়ে কষ্ট পেতে পারে ভেবে বাচ্চাদের মতো দু'জনের গা ঘেঁষে বসেন।তাঁরা যে আবদার করেছে নবীজি ﷺ এর চেয়ে ও উত্তম কিছু তাদের দিয়েছেন, শিখিয়েছেন।

খাদিম দেওয়ার পরিবর্তে রাসুল ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা -কে আরও একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজি ﷺ -এর কাছে এসে একটি খাদিম চাইলেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "তুমি বরং এ দোয়া পড়ো-

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ ،فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

"হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশের রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন নাজিলকারী! আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকরি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম-আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনি সর্বশেষ- আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না, আপনি সবকিছুর ওপরে-আপনার ওপরে কিছুই নেই, আপনি সর্বনিকটে-আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।"(সহিহ মুসলিম:২৭২৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে দুনিয়া বিমুখী ছিলেন তিনি তাঁর মেয়েদের ও তাই শিখিয়েছেন।

নফল নামাজের কথা স্মরণ করে দেয়া

এক রাতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে বললেন, তোমরা কি সালাত (তাহাজ্জুদের) আদায় করছ না? আলী রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ তাআলার হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মর্জি করবেন, জাগিয়ে দেবেন।' নবীজি ﷺ এ কথা শুনে চুপচাপ ঘুরে দাঁড়ালেন। আলীর কথার কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। আলী রাদিআল্লাহু আনহু শুনতে পেলেন তিনিﷺ ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন-

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا

‘মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।’

(সহিহ বুখারী,ইফা:১০৬০)

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, সন্তান পরিবার সবাইকে ইবাদত এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।হোক তা নফল। হাদিস থেকে কিয়ামুল লাইলের ফজিলত সম্পর্কেও বুঝা যায়।

এখানে সুন্দর একটি শিক্ষা হলো নফল ইবাদত করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া খোঁজ নেয়া সে করছে কিনা এর গুরুত্ব বুঝানো এসব করা সুন্নাহ। কিন্তু কেউ যদি না করে তাকে বকাবকি জবরদস্তি করা যাবে না।

তবে অলসতা বা অমনোযোগী হয়ে কোন ইবাদত ছেড়ে না দেয়া উত্তম।
উরুতে করাঘাত করে আয়াতটি তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাসুল ﷺ মূলত এটিই বুঝিয়েছিলেন যে, আল্লাহর কাছে তাওফিক চাওয়ার পাশাপাশি বান্দাকে ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকেও সচেষ্ট ও আগ্রহী হতে হবে।

এ হাদিসে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, তাহাজ্জুদ যেহেতু ওয়াজিব কোনো আমল নয়; বরং নফল আমল, তাই রাসুল ﷺ তাঁদের দুজনকে সে অনুযায়ী উৎসাহিত করেছেন। আলী রাদিআল্লাহু আনহু -এর জবাব শুনে তিনি চলে গেলেন। অনথ্যায় যেকোনো ওয়াজিব আমলের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ তাঁদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতেন না। ওয়াজিব পালনে শিথিলতা তিনি সহ্য করতেন না। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

(ইবনে বাত্তাল কৃত শারহু সহিহিল বুখারি: ৩/১১৫, হাশিয়াতুস সিনদি: ৩/২০৫।)

কন্যাকে আল্লাহর শাস্তির বিষয় জানানো

নবীজি ﷺ একবার ফাতেমাকে রাদিআল্লাহু আনহা কে বললেন, "ফাতেমা, জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারব না।" (সহিহ বুখারী:২৭৫৩)

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের মমার্থ হচ্ছে - "মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে কী চাও বলো, (কিন্তু) আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচাতে পারব না।" অর্থাৎ, তোমার বংশ তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

কন্যাকে সুসংবাদ দেয়া

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা একদিন আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তাঁর ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি কথা বললেন। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে বললেন, 'কাঁদছ কেন?' নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় চুপিচুপি কী যেন তাঁকে বললেন। তিনি এবার হেসে উঠলেন। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, 'আজকের মতো দুঃখ ও বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশি আমি আর কখনো দেখিনি।' আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁকে পরে জিজ্ঞাসা করলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথাকে প্রকাশ করব না।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পর আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কী বলেছিলেন?' ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রতিবছর একবার আমার সঙ্গে পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দুইবার কুরআন পাঠ করেছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে।' তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, 'আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসী মহিলাদের অথবা মুমিন মহিলাদের রানি হবে? এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।' (সহিহ বুখারী : ২৬২৪)

সন্তানদের জিকির ও দু'আ শিখাতেন

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুল ﷺ ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কে বলতেন, "ফাতেমা, আমার উপদেশ শুনতে কীসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এ দোয়া পড়বে-

يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমারই রহমতের আশ্রয় চাই। আমার জন্য আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে সোপর্দ কোরো না।"

সন্তানদের মৃত্যুতে শোকাহত হওয়া

ইবরাহিম যখন মারা যায়, তখন রাসুল ﷺ বলেন, "ইবরাহিম আমার ছেলে। দুধপানের বয়সে সে মারা গেছে। তার জন্য জান্নাতে দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা রয়েছে-তারা তার দুধপানের সময়টুকু পূর্ণ করবে।"

(সহিহ মুসলিম: ২৩১৬)

আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু আরও বলেন, "আমরা কামার আবু সাইফের ঘরে গেলাম। তার স্ত্রী নবীজির ﷺ পুত্র ইবরাহীমকে দুধপান করাতো। নবীজি ﷺ ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুমো খেলেন এবং তার ঘ্রাণ নিলেন। পরে ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন।"

এটি দেখে আব্দুর রাহমান ইবন আওফ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনিও, আল্লাহর রাসুল!' শুনে তিনি জবাব দিলেন, "ইবনে আওফ, এ তো করুণার কান্না।" এরপর আরেকবার হলো (অর্থাৎ প্রথম কান্নার পর আবার কাঁদলেন)। এরপর তিনি বললেন, "চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, অন্তর কষ্টে মুচড়ে ওঠে, কিন্তু আমরা রব্বকে সন্তুষ্ট করে এমন

কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না। ইবরাহীম, তোমার চলে যাওয়াতে তো আমরা কষ্ট পেয়েছি।”

(সহিহ বুখারী:ইফা,১২২৫)

আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহর ﷺ কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা তার কবরের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলেন এবং সে সময় তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ ছিলো। (সহিহ বুখারী:১২৮৫)

ইবরাহিমের ইন্তেকালের কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। এতে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে লোকসকল! সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে দুটি নিদর্শন। এ দুটি গ্রহণ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখো, তখন সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকো।' (সহিহ মুসলিম, ইফা: ১৯৬২)

নবীজি ﷺ এখানে আল্লাহর প্রতি ক্রোধ কিংবা হতাশা হয়ে কান্না করেন নি । সন্তান মারা যাওয়ায় তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়েছে। সন্তানের প্রতি মায়া মমতা ভালোবাসা প্রতিটি পিতারই থাকে। সন্তান মারা গেলে সবার চোখে ই পানি আসবে তেমনি একজন পিতা মুহাম্মাদ ﷺ -এর চোখেও অশ্রু এসেছে।

আত্মীয়তার বন্ধন

রাসুলুল্লাহ ﷺ নাতিনদের সাথে যেমন ছিলেন

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাতি- নাতিনদেরকে অনেক মুহাব্বত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাতিরা পেয়েছেন উত্তম শিক্ষা। তাঁদের শিক্ষক ছিলো সয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে তাঁরা দীক্ষিত হয়ে মহৎ গুণাবলির অধিকার হয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাতি নাতনিদের নামসমূহ:

- হাসান ইবনে আলী,হুসাইন ইবনে আলী,মুহসিন ইবনে আলী,উম্মে কুলসুম বিনতে আলী,যায়নাব বিনতে আলী, সবাই ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর ছেলে-মেয়ে।
- আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ছিলেন রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা এর ছেলে।
- উমামা বিনতে আল-আস, আলী ইবনে আল-আস তাঁরা দুই জন জাইনাব রাদিআল্লাহু আনহা এর ছেলে-মেয়ে ছিলেন।

উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা এর কোন সন্তান ছিলো না।

নবীজির ﷺ মেয়ে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এর দুই ছেলে হাসান রাদিআল্লাহু আনহু ও হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে নবীজি ﷺ এর বংশধারা এখনো চালু আছে। হাসানের বংশধরদের হাসানী এবং হুসাইন এর বংশধরদের হুসাইনী বলা হয়।

নাতিদের প্রতি ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ ﷺ নাতিদেরকে নিয়ে খেলাধুলা করতেন। তাঁদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতেন। সালাতের মধ্যে কেউ দুষ্টামি করলে সহ্য করতেন। হাদিসে আছে আবু বকরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবীজি ﷺ সালাত পড়ার সময় সিজদায় গেলে হাসান তাঁর কাঁধে চড়ে বসত। নবীজি ﷺ তাকে আলতো করে নামিয়ে দিতেন, যেন মাটিতে পড়ে না যায়। সে এরকম একাধিকবার করল। সালাত শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনাকে হাসানের সাথে এমন কিছু করতে দেখলাম, যা আগে কখনো দেখিনি।' নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, "সে এ-জীবনে আমার রায়হান (একধরনের সুগন্ধি গাছ)। আমার এই বাচ্চা একদিন নেতৃত্ব দান করবে এবং মুসলিমদের দুটো বিশাল দলের মাঝে সে সমঝোতা করে দেবে।"

(আহমদ:১৯৯৯৪)

নাতিদের কোলে নিয়ে চুমু দিতেন। তাঁদেরকে নিজের কাঁধে চড়াতেন।
আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ এক কাঁধে হাসান, আরেক কাঁধে হুসাইনকে নিয়ে বাইরে বের হলেন। তাদেরকে চুমু দিলেন। এভাবে লোকদের কাছে পৌঁছলে একজন বলে উঠল, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি তাদের ভালোবাসেন!'

নবীজি ﷺ বললেন, "যে তাদের ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। যে তাদের ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করে।" (আহমদ:৯৩৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ নাতিদের জন্য দু'আ করতেন। হাদিয়া পেলে নাতিদের জন্য একাংশ রেখে দিতেন।

একদিনের ঘটনা, হাসান ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কোলে প্রসাব করে দিলেন। লুবাবা বিনতে হারিস রাদিআল্লাহু আনহা নবীজি ﷺ কে বললেন,আপনার জামা পরিবর্তন করে নিন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি। তিনি ﷺ বললেন, ‘কেবল বাচ্চা মেয়ের প্রসাব লাগলে ধুয়ে দিতে হয়,কিন্তু বাচ্চা ছেলের প্রসাব হলে সেটার উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।’

(আবু দাউদ:৩৭৫)

আবু লায়লা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবীজির ﷺ সঙ্গে ছিলাম আর হাসান কিংবা হুসাইন তাঁর বুক বা পেটের ওপর শুয়ে ছিল। আমি দেখলাম, সে প্রসাব করে দিচ্ছে; তাই আমি তাকে নিতে উঠে দাঁড়ালাম। নবীজি ﷺ বললেন, “থাক, তাকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না। প্রসাব করা শেষ করতে দাও তাকে।" এরপর তিনি সেটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেন এবং প্রসাব পানির সাথে ধুয়ে চলে গেল।"

(আহমদ:১৮৫৮০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কতটা সুন্দর অমায়িক আচরণ ছিল। কারো কোলে বাচ্চা প্রসাব করার সময় নড়াচড়া করলে ভয় পেতে পারে রাসুলুল্লাহ ﷺ এই বিষয় টা খেয়াল রেখেছেন। এবং হাদিসের মাধ্যমে আমরাও জানতে পারলাম এমন পরিস্থিতিতে বাচ্চাকে নড়ানো উচিত নয়। এতে করে বাচ্চা ভয়ে প্রসাব করতে না পারে। প্রসাব আটকে থাকলে অনেক সময় অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'হাসান বিন আলী সাদাকার খেজুর হতে একটি খেজুর তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। সাথে সাথে নবীজি ﷺ "কাখ, কাখ" বলে উঠলেন যেন হাসান রাদিআল্লাহু আনহু খেজুরটা ফেলে দেয় মুখ থেকে।এরপর বললেন, "তুমি কি জানো না যে, আমরা সাদাকা খাই না?"

'এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়,বড়রা যে জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, ছোটদেরও সে জিনিস পরিহার করতে হবে। আর এ বুঝটা ছোটদের প্রদান করা বড়দের ওপর ওয়াজিব দায়িত্ব।

শিশুদের উপকারী কথা ও কাজ শেখাতে হবে। যদিও তারা শরিয়তের বিধান মানার বাধ্যবাধকতার বয়সের নয়, তবুও হারামের মতো ক্ষতিকর কথা ও কাজ করতে নিষেধ করতে হবে তাদের। '

রাসুলুল্লাহ ﷺ নাতি-নাতনিদের গভীর ভালোবাসা ও মমতায় বড় করে তুলেছেন। ছোটবেলা থেকেই ইসলামের সমস্ত বিধি বিধান সম্পর্কে শিখিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ শিশুদের কে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। শিশুদের সাথে শিশুসুলভ আচরন করে তাদের সাথে মিশে খেলাধুলা করতেন। আদুরে ডাক দিয়ে তাদের কাছে টেনে আদর করতেন। কখনোই তাদের ওপর বিরক্ত হতেন না। তাদেকে আঘাত করতেন না। তাদের প্রতি দয়া করতেন স্নেহ,মমতা দিয়ে আগলে রাখতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ছোটদের প্রতি যে দয়া দেখায় না,সে আমাদের দলের মধ্যেই পড়ে না।’(সুনানে তিরমিজি:১৯২১)

শিশুরা হচ্ছে ফুলের ন্যায়। তাদেরকে আঘাত করে বকাঝকা করে কোন কিছু শিখালে তার বিপরীত কিছু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আমাদের উচিত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী শিশুদের সাথে শিশুসুলভ আচরন করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মীয় - স্বজনদের সাথে যেমন ছিলেন

“তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।

১।অভ্যস্ত মদ্যপায়ী

২।আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী

৩। জাদুতে বিশ্বাসী।”

(মুসনাদে আহমাদ:১৯৫৮৭)

আত্মীয়তা সম্পর্ক এতটাই জোরালো যে, এটা যারা ছিন্ন করবে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।যারা এই সম্পর্ক অটুট রাখে, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

وَا لَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَا فُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَا بِ

"তারা সে সব সম্পর্ক সম্বন্ধ বহাল রাখে যা বহাল রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয়াবহ হিসাব নিকাশকে ভয় পায়।"

(সুরা রাদ আয়াত:২১)

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّا رِ

"পরকালের ঘর প্রাপ্তি এদের জন্যই নির্দিষ্ট।"

(সুরা রাদ আয়াত:২২)

আর যারা এই সম্পর্ক অটুট রাখে না, তাদের তীব্র নিন্দা করে আল্লাহ বলেন,

وَا لَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَا قِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَ رْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّا رِ

"আর যারা আল্লাহর সাথে শক্ত ও‘য়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি অভিশাপ, তাদের জন্য আছে অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।"

(সুরা রাদ আয়াত:২৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আত্মীয়তা রক্ষাকারীর মধ্যে সর্বোত্তম। তিনিﷺ সর্বদা চেষ্টা করতেন তাঁরﷺ আত্মীয় স্বজনদের মাঝে সম্পর্ক অটুট রাখার। তাদের হক আদায় করার। তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন।
রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম আত্মীয়দের মাঝেও সম্পর্ক রাখার কথা বলেছেন।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,
“রাসুলুল্লাহ ﷺ জীবদ্দশায় আমার আম্মা মুশরিক থাকতে একবার আমার কাছে আগমন করলেন। আমি রাসুল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী, আমি কি আমার আম্মার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনিﷺ উত্তর দিলেন, ‘হ্যা’ তুমি স্বীয় মাতার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখো।” (সহিহ বুখারী: ইফা,২৪৪৪)

নবীজি ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর।
রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলামের শুরু থেকেই দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেছেন আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই। আল্লাহ যখন আদেশ করলেন,

وَاَ نْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَ قْرَبِيْنَ

" তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের"
(সুরা শুআরা আয়াত:২১৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখনি উঠে নিজ পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্য বললেন, “কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা নিজেদের আজাব থেকে রক্ষা করো। আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবোনা। আব্দে মানাফের বংশধরেরা, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। হে রাসুলের ফুফু সাফিয়া, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, তুমি আমার সম্পদ থেকে যা দরকার চেয়ে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। "
(সহিহ বুখারী: ২৭৫৪)

মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে (হাদিস: ২০৪) এসেছে, এরপর রাসুল বলেন, 'তবে আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব।'

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ডাকে কেউ সাড়া দেয় নি। তবে নবীজি ﷺ কাছের বন্ধু মেয়ে স্ত্রী আরও কয়েকজন ছিলেন মুসলিম হিসেবে প্রথম দিকের সদস্য। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটাত্মীয়ের আলী রাদিআল্লাহু আনহা কে ইসলামের দাওয়াত দেয়াতে তিনি কবুল করেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মীয়দের প্রশংসা করতেন। তাঁদের উপদেশ পরামর্শ গ্রহন করতেন।

আবু সুফইয়ান 'ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "মক্কা-বিজয়ের দিন আব্বাস বিন হারবকে নিয়ে রাসুল ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। আবু সুফইয়ান রাদিআল্লাহু আনহু মক্কার নিকবটর্তী জায়গা মাররুজ জাহরানে ইসলাম গ্রহণ করলেন।"

তখন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ও বললেন, "আল্লাহর রাসুল, আবু সুফইয়ান গৌরব পছন্দ করে। আপনি যদি তাকে একটু গৌরবান্বিত করতেন।"

রাসুল বললেন, "হাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি দরোজা বন্ধ করে ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ।" (সুনানু আবু দাউদ:৩০৩১)

তিনি ﷺ সবসময় চেষ্টা করতেন আত্মীয়দের মাঝে দ্বীন প্রচার করা। সুযোগ পেলেই তিনিﷺ ছুটে যেতেন তাদের মাঝে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেন। জুলুম করতেন।কটাক্ষ করে কথা বলতেন। এত কিছু সহ্য করার পরও রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যপারে উদাসীন ছিলেন না। তাদের শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়দের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে ইবাদতের প্রতি,কল্যানময় কাজের প্রতি উৎসাহ দিতেন,বিপদে পরলে সাহায্য করতেন,উপকারী দু'আ শেখাতেন।

আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি।" তিনি বললেন, "আপনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।" কিছুদিন পর আমি পুনরায় একই কথা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি।" তিনি বললেন:

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসুলের চাচা, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।"

আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ - কে বললাম, "আল্লাহর রাসুল, আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন। সে দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাব আমি।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কাছে (আফিয়াত) সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করুন।" (সুনানুত তিরমিজি : ৩৫১৪)

নবীজি ﷺ আত্মীয়দের খোঁজখবর নিতেন,অসুস্থ হলে যত্ন করতেন। আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করতেন।তাদের জন্য দু'আ করতেন।

সাহাবিদেরকে আত্মীয়তা সম্পর্কের ব্যপারে বলতেন। তাদের হক আদায়ের বিষয় সচেতন করতেন। আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এর ইফকের ঘটনাতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর যেসব আত্মীয় মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়েছেন, পরবর্তীতে যখন আয়াত নাজিল হলো তখন, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন তাদের কে দান করবে না,তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বাঁধা দেন। এরূপ কাজ যেন না করে। তাদের হক আদায় করার কথা বলেছেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা তোমাদের বংশগত বিদ্যা শিক্ষা করো অতঃপর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তোমাদের একজনের

সাথে তার ভাইয়ের বিবাদ হবে, যদি সে জানত তার ও এর মাঝে আত্মীয়তা-সম্পর্কের কী গুরুত্ব রয়েছে, তাহলে তা তাদের এই সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখত।
(তাফসিরে তাবারি,১/১৪৪)

আতা বিন আবি রাবাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আমার আত্মীয়ের জন্য এক টাকা খরচ করাকে দরিদ্র ব্যক্তির জন্য এক হাজার টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু মুহাম্মাদ! যদি আত্মীয়টি ধনাঢ্যতায় আমার মতো হয় তবুও? তিনি বললেন, যদি সে তোমার চেয়েও বড়ো বিত্তশালী হয় তবুও।
(ইবনে আবিদ্দুনিয়া,মাকারিমুল আখলাক,৬২)

যাকাত দেয়া কিংবা সাদাকা করা,এসব কিছু তে সবার প্রথম হকদার হচ্ছে নিকটাত্মীয়। এদের মধ্যে কেউ গরিব থাকে কিংবা ঋণগ্রস্ত থাকে তাকে সাহায্য করা দায়িত্বের মধ্যে পরে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সিরাহ,বিভিন্ন হাদিস পড়লে বুঝা যাবে আত্মীয়দের সাথে কেমন ছিলেন আমাদের নবীজি ﷺ। কত কষ্ট সহ্য করার পরও তাদের কে মাফ করে দিতেন,আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতেন না।

নিজের রক্তে সম্পর্কের মধ্যে যতই ঝগড়া মারামারি হোক না কেন,যার সাথে যে সম্পর্ক হয়ে যায় তা তো আজীবন ই থাকে। ভাইয়ের যখন বোন হয়, এই বোন সম্পর্ক টা আজীবন ই থেকে যায় এই সম্পর্ক বদলানো যায় না। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে দ্বীনের সবকিছু ঠিক থাকলেও আত্মীয়দের মাঝে আমাদের সম্পর্ক ঠিক থাকেনা। সামান্য একটু কটু কথাতেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেই,মাস বছর চলে যায় তাদের সাথে কথা বলা হয় না। কে কেমন হালতে চলছে তা জানা হয় না। অথচ আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আমরা উদাসীন হয়ে যাচ্ছি। কুরআন এর আয়াত সম্পর্কে আমরা যেন জেনেও না জানার মতো করে চলি। রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে কীভাবে চলতে হবে কিভাবে তাদের সাথে মিশতে হবে এটা জানা সত্ত্বেও আমরা তেমন ভাবে চলি না। রবের হুকুম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা অমান্য করি।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَا لْاَ رْحَا مَ ۭاِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"
(সুরা নিসা আয়াত:১)

আমরা ভুলে যাই আমাদের প্রিয়জন, আমাদেরই রক্তের, আমাদেরই আপনজনের কথা। আমাদের উচিত আল্লাহ যা বলেছেন তা সঠিকভাবে পালন করা।

উপসংহার

রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। "

(সুরা আল-আহজাব:৩১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আপন আপন অবস্থানের বিচারে রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে জানা সবার জন্য অতীব জরুরি, যাতে তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

মানুষ যার কথা ও কর্মের অনুসরণ করে তাকে আদর্শ বলা হয়।

মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর ঘৃণ্য মানসে আল্লাহর শত্রুদের সৃষ্ট নানান সংশয় ও সন্দেহ বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ-এর সুন্নাহর

অনুসরণ ব্যতীত এসব ফিতনা থেকে বাঁচার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। রাসুল ﷺ সুন্নাহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহের কোন বিকল্প কিছু নেই।

সংসার জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সুন্নাহ অনুসারে চলা দাম্পত্য জীবনে অপরিহার্য।

আজকাল যে হারে ডিভোর্স এর পরিমাণ বাড়ছে, সাংসারিক কলহ সৃষ্টি হচ্ছে এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ অনুসরন করা।

নবীজি ﷺ আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কীভাবে চলতে হবে। নবীজি ﷺ এর কথা অনুযায়ী সাহাবিরা চলতেন। আমাদের ও উচিত সে অনুযায়ী চলা। তাহলে সংসার জীবন হয়ে উঠবে মধুময়।

নবীজি ﷺ কে ভালোবাসা মানে তাঁর সুন্নাহ অনুসরন করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতেন, মেয়েদের সাথে, নাতি-নাতনীদের সাথে, আত্মীয় স্বজন,পাড়া প্রতিবেশি, অতিথিদের সাথে কীরূপ আচরন করেছেন। এসব বিষয় জানতে হলে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সীরাহ সম্পর্কে জানতে হবে। সংসার সুন্দর করে সাজাতে হবে আমাদের মেহনতে,পরিশুদ্ধভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের তাওফিক দান করুন।